মাসিক

ইসলাম নারী ও সময়

মহিলাকণ্ঠ

রেজি. নং : ডিএ নং-৬২০৭। বর্ষ : ৩, সংখ্যা : ০৩

জুলাই ২০১৫

ঈদ সংখ্যা

[বর্ধিত কলেবর]

স্বপ্ন
ঈদভাবনা
কলাম
উপন্যাস
গল্প
ভ্রমণ
আত্মকথন
অনুভূতি
রান্না এবং
নিয়মিত সকল বিভাগ

মাসিক
মহিলাকণ্ঠ
ইসলাম, নারী ও সময়
www.mohilakantho.com
রেজি. নং : ডিএ নং- ৬২০৭ ● বর্ষ : ৩ ● সংখ্যা : ০৩
জুলাই ২০১৫ . রমজান-শাওয়াল ১৪৩৬ . আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২২

সূচিপত্র

সম্পাদক
মুফতি তাজুল ফাত্তাহ
সহযোগী সম্পাদক
আলেমা সাদেকা তালুকদার
সহকারী সম্পাদক
মাওলানা সায়ীদ উসমান
কিশোর কানন পরিচালক
আতিক রহমান
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মাওলানা তোফাজ্জল হোসেন
ম্যানেজার
মুহাম্মাদ তাওহীদুল ইসলাম
সার্কুলেশন সহকারী
আবু রায়হান

মূল্য ২০ টাকা মাত্র

যোগাযোগ
৮৫/১ সি, (২য় তলা)
পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০
সম্পাদনা : ০১৯১৩ ০৫৫ ২৬৬
বিজ্ঞাপন : ০১৯১৬ ০৫৫ ২৬৬
সার্কুলেশন : ০১৯১৯ ০৫৫ ২৬৬
ই-মেইল : mohilakantho@yahoo.com
ফেসবুকে পড়ুন : facebook.com/mohilakantho

৪৩ রসুলপুর, দনিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২৩৬ থেকে
এবিএম রাফি কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বি.এস. প্রিন্টিং প্রেস, ৫২/২, টয়েনবি সার্কুলার রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত

সম্পাদকীয়



সারা পৃথিবীতে এই মুহূর্তে শরণার্থী মানুষের সংখ্যা পাঁচ কোটির বেশি। এদের অধিকাংশই মুসলিম। সিরিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক, ইয়ামেন, সোমালিয়া, মধ্য আফ্রিকা, আরাকানসহ আরও বহু দেশের মানুষ যুদ্ধ ও সহিংসতার ফলে উদ্বাস্তু হয়ে দিন গুজরান করছে অন্যদেশে।

এই ঈদে প্রায় দেড়শো কোটি মুসলমানের ঘরে ঘরে আনন্দ আর খুশির হিল্লোল বয়ে যাবে। কিন্তু যেসব মুসলিম নিজেদের ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজনহীন হয়ে খোলা আকাশের নিচে ছেঁড়া তাবুর নিচে বসবাস করছে, তাদের নিরন্ন মুখে কি খুশির ফোয়ারা ফুটবে? উদ্বাস্তু শিবিরের ছোট ছোট নিষ্পাপ শিশুরা কি ঈদের দিনটাকে মাতিয়ে নিতে পারবে আনন্দের ডামাডোলে? নাকি এদিনও তাদের দিন কাটবে অনাহারে? তাদের বাঁচতে হবে যুদ্ধ, রক্ত আর স্বজন হারানো বেদনার হাহাকার বয়ে?

এই ঈদে আমরা কি পারি না তাদের জন্য অকাতরে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করতে? আল্লাহ! তুমি সমস্ত উদ্বাস্তুকে তাদের ঘরে ফিরিয়ে দাও। মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে দাও।

দুই.

প্রিয় রমজান মাস চলে যাচ্ছে। ঈদ সমাগত। আনন্দের বারতা নিয়ে দুয়ারে দাঁড়িয়ে হাসবে শাওয়ালের বাঁকা চাঁদ। প্রতিটি মুসলিম জনপদে ছড়িয়ে পড়বে খুশির প্রলম্বিত আবহ। এখন শুধু অপেক্ষার পালা।

রহমত, মাগফেরাত ও নাজাতের দিনগুলো বিদায় নিচ্ছে। মুমিনহৃদয়ে নীরব হাহাকার গুঞ্জরিত হচ্ছে যেন। কতোদিনের অপেক্ষা ছিলো! আবার চলে যাচ্ছে! এ মাসে মুমিনগণ সারা দিনমান ক্ষুধার্ত থেকে ক্ষুধার যাতনা সহ্য করেন। তবু এ মাসের জন্য তারা অপেক্ষা করেন সারা বছর। কী অদ্ভুত ভালোবাসা! এমন ভালোবাসাকে অমর করে রাখতে আমরা আগেই ঘোষণা দিয়েছিলাম মাসিক মহিলাকণ্ঠের বিশেষ ঈদসংখ্যার। আল্লাহর অগুনতি শোকরিয়া, আমরা সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি সংখ্যাটিকে ঈদের আমেজে সাজানোর। ঈদবিষয়ক প্রবন্ধ, গল্প, ভ্রমণ, অনুভূতির অক্ষর মায়াজালে পাঠকের সামনে হাজির হয়েছে বর্ধিত কলেবরের মহিলাকণ্ঠ। সংখ্যাটি পড়ে কেমন লাগলো আপনাদের, সে কথা জানাতে ভুলবেন না আশা করি। আপনাদের ছোট ছোট অনুভূতি, মন্তব্য, আশাবাদ, হতাশা আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথকে দৃঢ় করবে। আমাদের ভালো ও ভুল, দুটোই ধরা পড়বে।

ঈদসংখ্যার সকল লেখক, পাঠক, হকার, বিক্রেতা, বিজ্ঞাপন-দাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে ঈদুল ফিতরের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়ার খোশ কিসমত দান করুন। আমিন!



পবিত্র কুরআন থেকে : সুরা ফাতিহার তাফসির {পর্ব : ১৮}

সফলতার জন্য তিনটি কাজ করতে হবে

মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

অনুবাদ : মাওলানা আবুজারীর আবদুল ওয়াদুদ

তিন কাজ করুন : মানুষের কাজ তিনটি। প্রথমত মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও সংকল্প করবে যে, আল্লাহ! আমি আপনার আনুগত্য করবো। দীনি কাজে আপনার নির্দেশ মান্য করবো। আপনার হুকুম-আহকাম অনুযায়ী জীবন যাপন করবো। গুনাহের ধারে কাছেও যাবো না। ফরজ-ওয়াজিবগুলো ঠিক ঠিকভাবে আদায় করবো। প্রথম কাজ হলো মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা ও সংকল্প করা।

দ্বিতীয় কাজ হলো, সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করা।

আর তৃতীয় কাজ হলো, আল্লাহকে বলা, হে আল্লাহ! আমার আছে শুধু প্রতিজ্ঞা করার শক্তিটুকু। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। এরপর যতটুকু সাধ্য ছিলো সে অনুযায়ী চেষ্টা করেছি। এখন আমি আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি। আপনি দয়া করে আমাকে সিরাতে মুস্তাকিমের উপর চলার তাওফিক দান করুন।

কোনো ব্যক্তি যদি এই কাজ তিনটা করে, তবে সে ব্যক্তি অবশ্যই কামিয়াব হবে। প্রথম কাজ হলো সংকল্প করা। দ্বিতীয় কাজ হলো সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা। আর তৃতীয় কাজ হলো দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর সাহায্য কামনা করা।

ইউসুফ আ.-এর কর্মপদ্ধতি : হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত ঘটনাগুলো নিছক কিচ্ছা-কাহিনি বর্ণনার জন্য আসেনি। বরং এর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা সব মুসলমানই জানে যে, জুলায়খা তাকে পাপকাজের জন্য প্ররোচিত করেছিলো। তখন তিনি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। জুলায়খা ছিলো একদিকে সুন্দরী রূপসী রমণী, অন্যদিকে আপন মনিবের সহধর্মিনী। সে সবগুলো দরজা বন্ধ করে তালা মেরে দিয়েছে। বের হওয়ার কোনো পথ নেই। বাইরে থেকে ভেতরে আসারও কোনো উপায় নেই। এমন অবস্থায় জুলায়খা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে পাপকাজের জন্য অনুরোধ নয় বরং নির্দেশ দিচ্ছে, আসো আমার সাথে মিলিত হও।

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম প্রথমে তো মুখে অস্বীকার করেন। কিন্তু জুলায়খা নাছোড়বান্দি, সে নানাভাবে তাকে বাধ্য করার চেষ্টা করে। এমনকি নিজেই তাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে। এমন অবস্থায় হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার কবল থেকে ছুটে দরজার দিকে দৌড়ে পালান। অথচ হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম দেখছেন, সামনে দরজা বন্ধ। বের হওয়ার কোনো উপায় নেই। কিন্তু তিনি মনে করলেন, আমার যতটুকু করার সামর্থ্য রয়েছে আমি তা করবো। দরজা পর্যন্ত পালানোর তো সুযোগ রয়েছে।

যাহোক, তিনি তার সামর্থ্যানুযায়ী চেষ্টা করেন। তিনি জুলায়খার হাত থেকে ছুটে দরজার দিকে দৌড়ে যান এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন, হে আল্লাহ! দরজা পর্যন্ত আসার সামর্থ্যটুকুই আমার ছিলো, আমি এসেছি। আমার যতটুকু করার আমি তা করেছি। এখন আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আপনি আমাকে এর হাত থেকে বাঁচান।

এবার বাঁচানোর কাজ আল্লাহর। সাথে সাথে আল্লাহর কুদরতে তালাবদ্ধ দরজাগুলো একে একে খুলে যেতে লাগলো। আল্লাহ তায়ালা তার মুক্তির পথ করে দেন।

দেখুন, হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম দু'টি কাজ করেছেন। প্রথমত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছেন, আমি এই অন্যায় কাজ করবো না। দ্বিতীয়ত তিনি তাঁর সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছেন। দরজা পর্যন্ত দৌড়ে গিয়েছেন। দরজা বন্ধ– তিনি এ বাহানা দেখাননি। বরং তিনি এরপরও দরজা পর্যন্ত দৌড়ে গিয়েছেন এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন– হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বাঁচান। এরপর তিনি যখন দরজা পর্যন্ত গিয়েছেন, সাথে সাথে দরজা খুলে গিয়েছে। গিয়ে দেখেন জুলায়খার স্বামী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

(এরপর পৃষ্ঠা ৪০)

মিডিয়া ভাবনা

মাসুদ মজুমদার

মিডিয়া বলতে সাধারণত পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিনকে বোঝানো হয়। তবে মিডিয়া বহুমাত্রিক হতে পারে। এর ব্যাখ্যা ব্যাপক, পরিধি অনেক বিস্তৃত। মিডিয়ার সাথে গণমাধ্যমের সম্পর্ক নিবিড়। আল্লাহ সম্ভবত মিডিয়া পছন্দ করেন। ফেরেশতার ধারণা মিডিয়ার সমান্তরাল। আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে ওহি নাজিল করেছেন। নবি-রাসুলের কাজ শুধু মিডিয়ার কাজ না হলেও কেন যেন মেলবন্ধন খুঁজে পাওয়া যায়। আসমানি কিতাবগুলো স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে সেতুবন্ধন করতে মিডিয়ার ভূমিকা পালন করেছে। মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। এখানেও মিডিয়ার ধারণা মিলে যায়। এ বক্তব্যের দাবি এই নয় যে, এটাই শুধু গ্রহণযোগ্য বক্তব্য। তবে এমন একটি ধারণা নির্মোহভাবে ভাবলে সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বিষয়টা কিভাবে দেখা হবে, তা আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার।

হাল আমলের মিডিয়া এক বিশাল জগৎ। এর ব্যাপ্তি আকাশজুড়ে। শব্দতরঙ্গের মধ্যে আমাদের বসবাস। বিজ্ঞান এই শব্দ ধরে এনে উপস্থাপন করে। যন্ত্র শব্দ ছড়িয়ে দেয়। সেই শব্দ আবার মুদ্রণযন্ত্রে ছাপা হয়ে বেরোয়। প্রযুক্তির উৎকর্ষ মানুষকে তথ্যের সাগরে ভাসাচ্ছে। একটি আলিফ ও একটি নোকতার মাধ্যমে কম্পিউটার মিডিয়াকে আসমান ছুঁইয়েছে। এ এক বিস্ময় বটে।

যারা মিডিয়ার ধারণা মগজে রেখে গণমাধ্যমে ভূমিকা রাখেন তারা ফেরেশতা নন। নবি-রাসুলও নন। তাদের উপস্থাপনা ওহিও নয়। তাহলে নীতি-নৈতিকতার একটা বেষ্টনী ছাড়া তার গতিবিধি-কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হবে কিভাবে? তাই মিডিয়ার সংজ্ঞা আছে। আছে গ্রহণযোগ্য ব্যাকরণও। ভাষার

জন্য যেমন ব্যাকরণ, ব্যাকরণের জন্য ভাষা নয়, তেমনি মিডিয়ার জন্য রীতিনীতি।

শব্দ তরঙ্গ হয়ে আকাশে ঘুরে বেড়ায়, যার সাধ্য আছে তার শক্তিমান যন্ত্রে তা ধরা পড়ে যায়। আমরা যা লিখি তাও কালজয়ী হয়ে যেতে পারে। আর যা ছাপি তা তো কোনোটাই ফেলনা নয়। তাই উদ্দেশ্যবিহীন সাংবাদিকতা হতেই পারে না। এই উদ্দেশ্য ঠিক করার জন্যই নীতিনিষ্ঠ সংজ্ঞাও ব্যাকরণ জরুরি।

মানুষ প্রয়োজনের জন্য সব কাজ না করলেও লক্ষ্যহীন কোনো কাজ করে না। ভালো-মন্দ ধারণা না থাকলে মানুষ উদ্দেশ্যহীন বিচরণ করতো। মানুষ যেহেতু মিডিয়া সৃষ্টি করে ও কাজে লাগায় তখন তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা স্বাভাবিক। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকলে সেখানে চিন্তা ও মনোজগতের উপস্থিতি অনিবার্য। এ অনিবার্যতার ফসলই নৈতিক ভিত্তি ও প্রয়োজনের তাগিদ সৃষ্টি করে।

তাহলে কী লিখছি, কী ছাপছি, কী পড়ছি, কী দেখছি ও শুনছি তা অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। মানুষকে শাসন করে তার বিবেক। বিবেক নিয়ন্ত্রিত হয় অনুসৃত অনুশাসন ও বিধিবিধান মেনে চলার মাধ্যমে। সেটা আসে বিশ্বাসের বীজ থেকে। বিশ্বাসের বীজ জন্ম নেয় জ্ঞানের গর্ভ থেকে। জ্ঞানের আধার সৃষ্টিকর্তা। তাই শিক্ষার আদি উৎস ওহি ও নবি-রাসুলের শিক্ষা। মানুষের মগজ ও বিবেক তারই বিস্তৃতি ঘটিয়েছে। এখনো ঘটাচ্ছে।

আমরা যারা সংবাদপত্র, বিভিন্ন সাপ্তাহিক-মাসিক, এমনকি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট, তারা দেশজ আইন মানি, বিবেকের শাসনের তোয়াক্কা করি না। আমরা নিজেরাই নিজেদের কল্যাণে সেন্সরশিপ মেনে চলি। তাও দেশের প্রচলিত আইন মানার চাপে, সত্য-মিথ্যার অনুভূতি লালনের জন্য নয়। তাই এ যুগের মিডিয়া প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। বস্তুনিষ্ঠতার স্থান দখল করে নিয়েছে বহুজাতিক কোম্পানির মুক্তবাজার নীতি। পেশাদারিত্ব হার মেনেছে শাসকের ইচ্ছা ও বণিকের বাণিজ্যিক মানসিকতার কাছে। পুঁজির দাসত্বের কাছে জিম্মি হয়ে গেছে মিডিয়ার চিরায়ত মূল্যবোধ সত্যাশ্রয়ী ধারণা।



তাই মিডিয়া একদিকে অস্ত্র, ভিন্ন অর্থে উপকরণ। অন্যদিকে বণিকের পণ্য। যারা ভাবেন অস্ত্র, তারা অসৎ পথে ব্যবহার করবেন– তাদের নীতিজ্ঞান অনুপস্থিত থাকবেই। সৎভাবে যিনি ব্যবহার করবেন, নীতিজ্ঞান তাকে পথ দেখাবে। যারা উপকরণ ভাববেন, তারা কিছু ভালো কাজ করার উপায় খুঁজবেন। যাদের ভাবনায় পণ্য, তারা বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করবেন।

তারপরও এই চৌহদ্দি ভাঙার প্রচেষ্টা অন্তহীন। এখনো অজু করে পেশাদারিত্ব রক্ষার চেষ্টায় সতত তৎপর। এ আশাবাদ হাতছানি দেয় বলেই আমাদের অস্তিত্ব টিকে আছে। টিকে আছে অর্ধসত্য ও কিছু মূল্যবোধ।

একজন মানুষ কখনো নিজের বিবেকতাড়িত দায়িত্ব পালন করে, কখনো নির্দেশিত হয়ে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। মানুষ কেন আইন মানে? প্রথমত, বিবেকের তাড়নায় নিজের ভালোর জন্য; দ্বিতীয়ত, ভয় থেকে। আইন না মানলে শাস্তি পেতে হবে বলেই আমরা বাধ্য হয়ে আইন মানি। তার পরও আইন অমান্য করেই চুরি-ডাকাতি হয়। দুর্নীতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বাঁধতে পারে। আইনের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীনতার কারণেই।

তাই মিডিয়া একদিকে অস্ত্র, ভিন্ন অর্থে উপকরণ। অন্যদিকে বণিকের পণ্য। যারা ভাবেন অস্ত্র, তারা অসৎ পথে ব্যবহার করবেন– তাদের নীতিজ্ঞান অনুপস্থিত থাকবেই। সৎভাবে যিনি ব্যবহার করবেন, নীতিজ্ঞান তাকে পথ দেখাবে। যারা উপকরণ ভাববেন, তারা কিছু ভালো কাজ করার উপায় খুঁজবেন। যাদের ভাবনায় পণ্য, তারা বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করবেন।

আজকের জগৎ মিডিয়ানির্ভর। মানুষকে হিরো বানায় মিডিয়া। জিরো বানায় মিডিয়া। সৎপথের আহ্বান জানাতে পারে মিডিয়া। মিথ্যার গোলকধাঁধায় ফেলতে পারে, তাও মিডিয়া। পশ্চিমা জগৎ মিডিয়ার মাধ্যমে মগজ ধোলাই করে আমাদের ওপর দাসত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। আমরা তা মানছি। তাদের প্রচারণা ও প্রতারণার ধূম্রজালে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। তাদের ভাষায় বলছি। তাদের চোখে দেখছি। তাদের মতো করে চলছি। এ অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে হলে প্রস্তুতি চাই। আপনি, আমি প্রস্তুত তো?

আগামী দিনের যুদ্ধটা হবে মগজ দখল ও ধোলাই করার যুদ্ধ। পারমাণবিক অস্ত্র পেছনে পড়ে যাবে মিডিয়া যুদ্ধের কারণে। একজন তরুণ জীবনের শুরুতে অনেক কিছু হওয়ার বাসনা লালন করে। আগামী দিনের প্রযুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধে যারা এগিয়ে থাকবেন– তারাই নিয়ন্ত্রণ করবেন আগামী দিনের বিশ্ব।

লেখক : প্রবীণ সাংবাদিক, কলামিস্ট



ঈদ মুমিনরা অভাববোধ করুক

নোমান বিন আরমান

উৎসবের দিনে অভাববোধ! কেন, কীসের অভাববোধ করতে বলা হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পরে দিচ্ছি। আগে কিছু খুচরো কথা বলে নেয়া যায়। শুরুটা হোক প্রশ্ন দিয়েই। ঈদের উৎসবটা কেন, কাদের জন্যে? এটা কারও কারও কাছে পরিষ্কার না। একারণে কেউ কেউ ভাবনা-ভ্রান্তিতে ভোগেন। আর দশটা সামাজিক উৎসবের সাথে একে গুলিয়ে ফেলেন। কেউ কেউ আবার নিজেদের অসাম্প্রদায়িক প্রমাণ করতে ঈদের আগে সার্বজনীনতার সিল মারেন। আমরা সচেতনভাবেই এই সিল মারার, এই ভাবনা-ভ্রান্তির ব্যাপারে আপত্তি করছি। ঈদ সার্বজনীন নয়, মুসলিমজনীন উৎসব। এটা একান্তই মুসলমানদের। কেন?

উত্তরটা মিলবে ঈদ প্রচলনের ইতিহাসেই। ইসলামে ঈদ প্রচলনের সময় আরবসহ সারা বিশ্বেই নানা ধরনের উৎসব হতো। উৎসবের প্রচলন ছিলো। তার কোনো একটিকেও ইসলাম নিজের বলে স্বীকৃতি দেয়নি। সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে নতুনতর উৎসবের প্রচলন করেছে। আর সেটাও স্রেফ উৎসবের জন্যে নয়। এর সাথেও জড়িয়ে আছে ইসলামের ভাব-আদর্শ। চিন্তা ও চেতনা। দুইটি বড় ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে ঈদকে। প্রথমটি মাসব্যাপী সিয়াম সাধানার সাথে। দ্বিতীয়টি হজ ও কুরবানির সাথে সম্পৃক্ত।

এই দুই ইবাদতে যে মুসলিম নিজেকে সম্পৃক্ত করে; মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করেছে, তার কাছ থেকে গোনাহমাফি ও পুরস্কার অর্জন করেছে, তার জন্যেই উৎসব। তার জন্যেই ঈদ। অন্যকারও জন্যে নয়। আমরা জোরের সাথেই বলতে পারি, মুসলিমদের কেউ যদি দুই বড় ইবাদতের মাধ্যমে 'গোনাহমাফি ও পুরস্কার অর্জন' করতে না পারে, তার জন্যেও ঈদ নয়। ঈদটা তার লজ্জিত হবার দিন। ঈদের অবস্থান যখন এমনই সমর্পিত মুসলিমবান্ধব, তখন একে সার্বজনীন আখ্যা দিয়ে জাতে উঠার সুযোগ নেই।

ঈদ কারও 'সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান' নয় যে; তাতে মোল্লা-পুরোহিত, চোর-জোচ্চুর সকলকে নিমন্ত্রণ করতে হবে। কুরআন তেলাওয়াতের পর, গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটক পাঠ করে অনুষ্ঠানকে 'ধর্মনিরপেক্ষ ও সার্বজনীন' করতে হবে। ঈদ ধর্মপক্ষ। তাকে জোর করে স্যেকুলার বানানোর দরকার নেই। ঈদ মুমিনের পুরস্কার। যারা তার যোগ্য তাদেরই ঈদের পুরস্কার মিলবে। অন্যরা সেই পুরস্কার উৎসবে 'অ্যালাও' না। ঈদ নিপাট ইবাদত। নামাজ, রোজার মতোই ইবাদত। ঈদকে যারা সার্বজনীন বলেন, নামাজ-রোজার ব্যাপারে তারা হীনমন্যতায় কেন ভোগেন! ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে নামাজ-রোজার নিমন্ত্রণ করেন না কেন। জানি করবেন না। তখন যে আর নিজেদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। এই বক্তব্যের পর আমরা আশা করছি, সার্বজনীনের ব্যাপারে আপত্তির কারণটি সবার কাছে স্পষ্ট।

এবার প্রশ্ন হলো, ঈদের উৎসব কি সেইসব মুমিন সম্পৃক্ত হতে পারবে না, যারা 'গোনাহমাফি ও পুরস্কার অর্জন' করেনি? পারবে না, এমন কোনো বিধিনিষেধ নেই। কিন্তু একটি দৃষ্টান্ত আমরা উপস্থাপন করছি। ধরুন, একটা ক্লাসের ছাত্ররা কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। এখানে সবার সুযোগ সমান ছিলো। নির্দিষ্ট কিছু বিষয় পালন করলে সকলকেই পুরস্কৃত করা হবে। প্রতিযোগিতার সময় শেষে দেখা গেলো, ১০ জন পুরস্কার পাচ্ছে। ৯০ জন বাদ। এখন পুরস্কার পাওয়ার পর যে স্বাভাবিক খুশি আর উৎসব হবে, এতে কি একশজনের খুশিই সমান হবে? আনন্দে সবার অংশগ্রহণ সমান থাকেবে? নিশ্চয় না। পুরস্কার যারা পেয়েছে, তারাই প্রকৃত উৎসব পালন করবে। অন্যরা নিশ্চয় মুখ ভার করে থাকবে। নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করবে। রোজা, হজ ও কুরবানির পর ঈদের উৎসবটাও এমনই।

ঈদকে মুমিনদের মানোত্তীর্ণের অনুষ্ঠানও বলা যেতে পারে। এই ঈদে যারা পুরস্কৃত হলেন সেইসব মুমিন আর যারা এবার হতে পারলেন না, তাদের মানোত্তীর্ণ করার চেতনা নিয়ে সবার দুয়ারে ঈদ আসে।

একমাস সিয়াম সাধনার শেষে ঈদ হচ্ছে মুমিনদের পুরস্কার। ঈদগাহের ময়দানে ঈমানি চেতনার সম্মিলন। ইসলাম, ঈদকে হাসি-খুশি আর আনন্দের দিন হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ছেড়ে দেয়নি। সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে সম্মিলিত ইবাদত ও সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্তব্যের বাধ্যবাধকতা। সর্বসাধারণকে নিয়ে জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে, ধনীদের করেছে নির্দেশ। ক্ষুধার্ত, বঞ্চিতের আঙিনায়ও কল্লোলিত জ্যোৎস্নার উৎসব যাতে নামে, সেই ব্যবস্থা ও উদ্যোগ নিতে তাদের বলেছে। ঈদ আসে, মানবীয় মহিমার সুরা নিয়ে। যে সুরায় চুমুক দিয়ে মানুষ জেগে ওঠবে আত্মপরিচয় আর আত্মশক্তিতে। এবারের ঈদ আসুক সেই সুরা হয়ে, যে সুরায় চুমুকের পর পীড়িত, পতিত মুসলিম জাগবে। আত্মপরিচয়ে। আত্মশক্তিতে। সে জানবে, কীসে তার মুক্তি। কোথায় তার উত্তরণ।

এবার ঈদে অর্থহীন উৎসব নয়, মিষ্টিমুখ আর উদরপূর্তি খাবার নয়। এই ঈদে মুমিনরা অভাববোধ করুক। প্রচণ্ড রকমের অভাব। তার অভিভাবকত্বহীনতা আর খলিফার অভাব। তার বিচ্ছিন্নতা আর ছন্নছাড়া দশা সে দেখুক। সে মনে করুক, সেই ঈদের জামায়াতের কথা, যেখানে অভিভাবক হিসেবে খুতবা দিয়েছেন রাসুল সা.। সে মনে করুক, খলিফা আবু বাকার রা. খলিফা ওমার ইবনুল খাত্তাব রা. খলিফা ওসমান গানি রা. খলিফা আলী মুরতাজার রা. খেলাফতের অধীনের ঈদের জামায়াতগুলো। সে মনে করতে থাকুক। দেখতে থাকুক, কত প্রগাঢ় উচ্ছ্বাস আর পবিত্রতার আমেজ ছিল তাদের ঈদে। সে দেখুক, তাদের অনির্মল আর সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ববোধ। দুর্নিবার উম্মাহপ্রীতি। অবিরত সে দেখুক, তার সোনাঝরা অতীত, পতিত-পীড়িত বর্তমান এবং ত্রাসমাখা নিকষ আঁধারের ভবিষ্যতকে। এসব দেখে দেখে সে ভাসুক, চোখের জলে। সাঁতরাক, আবেগের স্রোতে। চোখ ফেটে তার রক্ত ঝরুক। অতঃপর, ঈদ তাকে উম্মাহপ্রাণে ঋদ্ধ করুক। সে জেগে ওঠোক আঁধারের বুক চিড়ে। সূর্যরাঙা শক্তির ঐশ্বর্যে।

লেখক : সাংবাদিক, কলামিস্ট

ইতিহাস-বিখ্যাত স্বপ্ন

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

স্বপ্ন সব মানুষই দেখে। একজন মানুষ জীবনে কতো হাজার লক্ষবার স্বপ্ন দেখে তার হিসাব সে নিজেও রাখতে পারে না। এভাবে পৃথিবীতে কতো লক্ষ কোটি স্বপ্ন ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে তার হিসাব আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। হাজার কোটি, লক্ষ কোটি, কোটি কোটি স্বপ্ন অন্যদের অজান্তে হারিয়ে যায়। তবে ইতিহাসে এমন কিছু স্বপ্নও ঘটেছে যা সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে জানাজানি হয়েছে, বহু মানুষ সে সম্বন্ধে অবগত হয়েছে। এগুলোকে বলা যায় ইতিহাস-বিখ্যাত স্বপ্ন। এমন কিছু স্বপ্নের কথাই এখানে তুলে ধরছি। এ স্বপ্নগুলো থেকে বোঝার ও শেখার রয়েছে অনেক কিছু।

১. হজরত ইব্রাহিম আ.-এর স্বপ্ন

হজরত ইব্রাহিম আ.-এর স্বপ্ন সম্বন্ধে কোরআনে কারিমে সুরা সাফ্‌ফাত-এর ১০২ থেকে ১০৭ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে এভাবে বর্ণনা এসেছে– (আয়াতসমূহের অর্থ) 'অতঃপর পুত্রটি (ইসমাঈল) যখন তার সাথে চলাফেরা করার মতো বয়সে পৌছলো (বয়স ১৩ বা সাবালক হয়েছে মাত্র) তখন তিনি (ইব্রাহিম) বললেন, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবেহ করছি। অতএব তুমিও চিন্তা করো, তোমার কী মত? তিনি বললেন, আব্বাজান! আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, পূর্ণ করুন। ইনশাআল্লাহ্ আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন। অতঃপর যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আত্মসমর্পণ করলো এবং পিতা পুত্রকে (জবেহ করার উদ্দেশ্যে) কাত করে শোয়ালো (এবং ছুরি চালালো) আর আমি তাকে ডাক দিলাম, হে ইবরাহিম! নিশ্চয়ই তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে। আমি বিশিষ্ট বান্দাদেরকে এভাবেই পুরস্কার প্রদান করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে এটাও ছিলো একটা বড় পরীক্ষা। আর আমি এর পরিবর্তে একটা শ্রেষ্ঠ জবেহের পশু দান করলাম (পুত্রের বদলে সেটিই কোরবানি হয়ে গেলো)।

উল্লেখ্য, হজরত ইব্রাহিম আ.-কে স্বপ্নে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কোরবানি করার জন্য। এই প্রিয় জিনিস দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলো তার পুত্র। সেমতে তিনি পুত্রকে বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখছি যে, আমি তোমাকে জবেহ্ করছি।

২. হজরত ইউসুফ আ.-এর স্বপ্ন

হজরত ইউসুফ আ.-এর রয়েছে একটি প্রসিদ্ধ স্বপ্ন। সুরা ইউসুফের ৪র্থ আয়াতে সে সম্বন্ধে এভাবে বর্ণনা এসেছে– (আয়াতসমূহের অর্থ) 'স্মরণ করো, যখন ইউসুফ তার পিতাকে বললো, হে আমার পিতা! আমি তো (স্বপ্নে) দেখেছি এগারোটি তারকা এবং সূর্য ও চন্দ্রকে; সেগুলোকে দেখেছি আমার প্রতি সেজদারত অবস্থায়।'

এখানে এগারো তারকার দ্বারা ইঙ্গিত ছিলো হজরত ইউসুফ আ.-এর এগারো ভাইয়ের প্রতি এবং সূর্যের দ্বারা পিতা ও চন্দ্রের দ্বারা মাতা'র প্রতি। আর সেজদা করার দ্বারা আনুগত্য প্রকাশের প্রতি ইঙ্গিত ছিলো। অর্থাৎ, একদিন এরা সবাই হজরত ইউসুফ আ.-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে। এরপর সুরা ইউসুফেরই ৯৯-১০০ নং আয়াতে এ স্বপ্নের বাস্তবায়ন কীভাবে হয়েছিলো তার বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে– (আয়াতসমূহের অর্থ) 'তারপর যখন তারা ইউসুফের কাছে (মিসরে) উপস্থিত হলো, তখন সে তার পিতা-মাতাকে তার কাছে স্থান দিলো এবং বললো, আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন। এবং সে (ইউসুফ) তাঁর পিতা-মাতাকে সিংহাসনে বসালো এবং তারা তার সম্মানে সেজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়লো এবং সে (ইউসুফ) বললো, হে আমার পিতা! এটাই আমার ইতিপূর্বের স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার প্রতিপালক তা সত্যে পরিণত করে দিলেন।'

উল্লেখ্য, এখানে যে সেজদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি ছিল সম্মানের সেজদা, ইসলামপূর্ব শরিয়তে এরূপ সাজদা জায়েয ছিল। আমাদের শরীয়তে এরূপ সেজদা জায়েজ নেই।

৩. রাসুল সা. এর স্বপ্ন

বোখারি শরিফের রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম আমার দু' হাতে দুটো স্বর্ণের চুড়ি। চুড়ি দুটো নিয়ে আমি বেশ দুশ্চিন্তায় পড়লাম। তখন ঘুমের মধ্যেই আমার কাছে ওহি করা হলো, ও দু'টোতে ফুঁ দাও। আমি ফুঁ দিতেই চুড়ি দু'টো উড়ে গেলো। আমি এ চুড়ি দু'টোর ব্যাখ্যা করেছি দু'জন মিথ্যুক, আমার পরে যে দু'জনের আবির্ভাব হবে। তাদের একজন হলো (মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার আসওয়াদ) আন্‌ছি, আর অপরজন হলো (মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার) ইয়ামামার অধিবাসী মুসাইলামা কাজ্জাব। (বোখারি, হাদিস নং ৩৬২১)

৪. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ রা.-এর স্বপ্ন

হিজরি প্রথম বা দ্বিতীয় সনে বর্তমানে প্রচলিত আজান প্রবর্তিত হয়। এর আগ পর্যন্ত নামাজের জন্য একটা সময় নির্ধারণ করে দেয়া হতো। সাহাবায়ে কেরাম নির্ধারিত সময়ে জামাআতের জন্য একত্র হতেন। তারপর এ বিষয়ে মাশওয়ারা হয়। এ পর্যায়ে আগুন জ্বালিয়ে জানান দেয়ার মাশওয়ারা এলে তাতে অগ্নিপূজারীদের সঙ্গে সাদৃশ্য হয় বিধায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা প্রত্যাখ্যান করেন। শিংগায় ফুঁক দিয়ে জানান দেয়ার মাশওয়ারা এলে তাতে ইহুদিদের সঙ্গে সাদৃশ্য হয় বিধায় তা প্রত্যাখ্যান করেন। ঘণ্টা বাজিয়ে জানান দেয়ার মাশওয়ারা এলে তাতে খৃস্টানদের সঙ্গে সাদৃশ্য হয় বিধায় তা প্রত্যাখ্যান করেন। হজরত ওমর রা. কোনো আহ্বানকারী নিযুক্ত করার পরামর্শ দেন যে নামাজের জন্য আহ্বান জানাবে।

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পরামর্শ মোতাবেক হজরত বেলাল রা.-কে এর দায়িত্ব প্রদান করেন। হজরত বেলাল রা. 'আসসালাতু জামিয়া' 'নামাজের জামাআত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে' বলে লোকদেরকে নামাজের জন্য আহবান জানাতে থাকেন।

পরবর্তীতে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ রা.-কে স্বপ্নে আজানের প্রচলিত শব্দগুলো শেখানো হয়। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত শোনান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এটি সত্য স্বপ্ন। এরপর থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজানের এই প্রচলিত শব্দাবলিযোগে আজান প্রদানের রীতি চালু করেন। তিনি হজরত বেলাল রা.-কে এ শব্দাবলিযোগে আজান প্রদানের নির্দেশ দেন।

হজরত ওমর রা. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ রা.-এর চেয়ে ২০ দিন পূর্বে স্বপ্নে আজানের এ শব্দগুলো দেখেছিলেন, কিন্তু তিনি ভুলে যান। যখন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট স্বপ্ন বর্ণনা করেন, তখন হজরত ওমর রা.ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তখন তারও নিজের স্বপ্নের কথা স্মরণ আসে। কিন্তু যেহেতু হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ রা. আগেই বলে ফেলেছেন, তাই তিনি শরমে নিজের স্বপ্নের কথা তখন ব্যক্ত করা থেকে বিরত থাকেন। পরে হজরত বেলাল রা. যখন এ শব্দাবলিযোগে আজান দেন, তখন তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর কাছে জানান যে, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমিও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছিলাম। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আলহামদুলিল্লাহ! বিষয়টি তাহলে আরও দৃঢ়তা লাভ করলো।

৫. হজরত ইবনে ওমর রা.-এর স্বপ্ন

বোখারি শরিফের রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে ওমর রা. বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে কেউ স্বপ্ন দেখলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তা বর্ণনা করতো। আমার মনে আকাংখা জাগলো আমিও কোনো স্বপ্ন দেখলে তা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তা বর্ণনা করতাম।

তারপর একদিন আমি স্বপ্নে দেখি দু'জন ফেরেশতা আমাকে ধরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। ... জাহান্নামে কিছু পরিচিত লোকও দেখলাম। তখন আমি বলতে থাকলাম, 'আউজু বিল্লাহি মিনা ন্নারি' অর্থাৎ, আমি আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই। ইতিমধ্যে আর একজন ফেরেশতা ওই দু'জন ফেরেশতার সঙ্গে যোগ দিলেন। সেই ফেরেশতা আমাকে বললেন, ভয় করো না।

আমি এ স্বপ্নটি (আমার বোন, রাসুল সা.-এর স্ত্রী) হাফসার কাছে বর্ণনা করলাম। সে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তা বর্ণনা করলো। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আব্দুল্লাহ কত ভালোমানুষ, যদি রাতের বেলা নফল পড়তো! হজরত ইবনে ওমর রা.-এর পুত্র সালেম বয়ান করেন, এরপর থেকে আমার পিতা রাতের বেলা সামান্যই ঘুমাতেন। (বোখারি, হাদিস নং ৩৭৩৮)

৬. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা.-এর স্বপ্ন

বোখারি শরিফের রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন, স্বপ্নে দেখি আমি এক বাগানে। বাগানের মাঝখানে একটা স্তম্ভ। স্তম্ভের উপরে একটা রশি। আমাকে বলা হলো, আরোহণ করো। আমি বললাম, পারি না। তখন একজন খাদেম এসে আমার কাপড় ধরে আমাকে উঁচু করলে আমি আরোহণ করতে পারলাম। উপরের রশি শক্তভাবে ধরলাম। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো এ অবস্থায় যে, আমি রশি (-এর বেষ্টনী) ধরে আছি। স্বপ্নটি আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি ব্যাখ্যায় বললেন, বাগান হলো ইসলামের বাগান, স্তম্ভ হলো ইসলামের স্তম্ভ (নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত ইত্যাদি আরকান) আর রশি বা হাতল হলো ঈমান। তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান-ইসলামকে ধারণ করে থাকবে। (বোখারি, হাদিস নং ৭০১৪)

৭. ইমাম মালেক রহ.-এর স্বপ্ন

হজরত ইমাম মালেক রহ. মদিনার প্রেমিক ছিলেন। তাঁর মনে-প্রাণে কামনা ছিলো মদিনাতেই যেন তাঁর মৃত্যু হয় এবং মদিনাতেই যেন দাফন হয়। শেষবয়সে একবার হজ্জে যাবেন কি না- এ নিয়ে

দুশ্চিন্তা এলো যে, হজ্জে গিয়ে মৃত্যু হলে তো মদিনায় আমার দাফন হবে না। তিনি প্রতিদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখতেন। ভাবলেন আজ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করবো।

সেদিন স্বপ্নে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আর কতদিন আমার হায়াত বাকি আছে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখে কিছু না বলে হাতের পাঁচটি আঙ্গুল দেখালেন।

ঘুম ভাঙ্গার পর তিনি পেরেশান হলেন- কী দেখলাম! আমার হায়াত পাঁচ বছর বাকি না কি পাঁচ মাস না পাঁচ দিন? একজন স্বপ্ন-ব্যাখ্যাদাতা জানালেন, পাঁচ আঙ্গুলের দ্বারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই পাঁচটা জিনিসের দিকে ইংগিত করেছেন যে পাঁচটি জিনিস সম্বন্ধে কোরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ ব্যতীত তা আর কেউ জানে না।

হাদিসেও এসেছে, হজরত জিব্রাইল আ. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেয়ামত কবে হবে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, এটা হলো ওই পাঁচটা জিনিসের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। (ফজলুল বারি শরহে বোখারি)

উল্লেখ্য, সেই পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ সম্বলিত সুরা লুকমান-এর ৩৪ নং আয়াতের তর্জমা নিম্নরূপ– 'নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছেই আছে কেয়ামতের জ্ঞান এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন যা কিছু গর্ভের ভেতরে আছে। আর কোনো ব্যক্তিই জানে না, আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কোনো ব্যক্তিই জানে না, সে কোন জমিনে মৃত্যুবরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সব বিষয়ে অবহিত।'

৮. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন সম্বন্ধে স্বপ্ন

স্বপ্ন-ব্যাখাজগতের ইমাম, প্রসিদ্ধ তাবেয়ি হজরত মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন রহ.-এর নিকট এক মহিলা এসে বললো, হজরত! আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। হজরত মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন রহ. তখন নাস্তা খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, হয় তুমি স্বপ্ন বর্ণনা করা বন্ধ করো, আমাকে নাস্তা খেতে দাও। না হয় আমি নাস্তা বন্ধ করে তোমার স্বপ্ন শুনি। মহিলা বললো, আপনি নাস্তা সেরে নিন।

নাস্তা শেষ হওয়ার পর মহিলাটি বললো, হজরত! আমি স্বপ্নে দেখি চন্দ্র সুরাইয়াতে ঢুকে পড়েছে। (সুরাইয়া হলো বৃষ রাশিতে অবস্থিত কৃত্তিকা নামক এক ক্ষুদ্র নক্ষত্রপুঞ্জ, যার ছয়টি সাধারণ দৃষ্টিতে গোচরীভূত হয়। আরবিতে একে বলে 'সুরাইয়া' আর ইংরেজিতে বলে Pleiades) আর আমার পেছন দিক থেকে একজন লোক বলছে, তুমি ইবনে সিরিনের নিকট গিয়ে এটা জানাও। স্বপ্নটি শুনে ইমাম ইবনে সিরিন উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী দেখেছো? মহিলাটি পুনরায় স্বপ্নের বিবরণ দিলো। শুনে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সিরিনের চেহারা বিবর্ণ হয়ে উঠলো, তিনি পেটে চাপ দিয়ে ধরে উঠে দাঁড়ালেন। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সিরিনের বোন (ভিন্ন বর্ণনামতে ফুফু) জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কী হয়েছে? তিনি বললেন, মহিলাটি বলছে, আমি আর মাত্র সাত দিন পরেই মারা যাবো। বস্তুত এমনই হয়েছিলো। এর সাতদিন পরই ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন ইন্তেকাল করেন। (শাজারাতুজ্জাহাব ও মির্‌আতুল জিনান)

ইবনে সিরিনের চেহারা বিবর্ণ হয়ে উঠলো, তিনি পেটে চাপ দিয়ে ধরে উঠে দাঁড়ালেন। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সিরিনের বোন জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কী হয়েছে? তিনি বললেন, মহিলাটি বলছে, আমি আর মাত্র সাত দিন পরেই মারা যাবো। বস্তুত এমনই হয়েছিলো। এর সাতদিন পরই ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন ইন্তেকাল করেন।

৯. ইমাম বোখারি ও তার মায়ের স্বপ্ন

ইমাম বোখারি রহ. একবার স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহ মোবারক থেকে মাছি তাড়িয়ে দিচ্ছেন। তিনি তাঁর উস্তাদ হজরত ইসহাক ইব্‌নে রাহওয়াহকে স্বপ্নটি শোনালেন। হজরত ইসহাক রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন, তুমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিহ হাদিসকে জয়িফ ও মাওজু হাদিস থেকে পৃথক করে দেয়ার কাজ করবে। অতঃপর ইমাম বোখারি সহিহ বোখারি রচনার কাজ শুরু করেন।

ইমাম বোখারির বাল্যকালে তাঁর মাতাও এক জীবন্ত স্বপ্ন দেখতে পান। ইমাম বোখারি বাল্যকালে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মা তাঁর দৃষ্টিশক্তির জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করেন। এক রাতে তাঁর মা স্বপ্নে দেখেন, হজরত ইব্রাহিম আ. তাঁকে বলছেন, আল্লাহ তাআলা তোমার দোয়া কবুল করেছেন। সকালে তিনি পুত্রকে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন দেখতে পান।

১০. হজরত শাহ আব্দুল আজিজ রহ.-এর সামনে একটি স্বপ্ন

দিল্লির প্রসিদ্ধ আলেম হজরত শাহ আব্দুল আজিজ রহ.-এর সময়ে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলো, সে পবিত্র কোরআন শরিফের উপর পেশাব করছে। সে খুব পেরেশান হলো, হায়রে আমি কি এতোই খারাপ হয়ে গেছি! আমার পরিণাম যেন কী হয়! সে হজরত শাহ আব্দুল আজিজ রহ.-এর কাছে এসে স্বপ্নটা জানালো। হজরত শাহ আব্দুল আজিজ রহ. স্বপ্নটি শুনে বললেন, মাশাআল্লাহ! তোমাকে সু-সংবাদ জানানো হয়েছে যে, তোমার পুত্র কোরআনের হাফেজ হবে। বাস্তবেও তা-ই হয়েছিলো। এ স্বপ্ন থেকে বুঝা গেলো কোনো স্বপ্ন খারাপ মনে হলেও আসলে তা খারাপ নাও হতে পারে। অতএব কোনো স্বপ্ন বাহ্যিকভাবে খারাপ মনে হলেই পেরেশান হতে নেই। কোনো বিজ্ঞ আলেমের কাছে সে স্বপ্ন সম্বন্ধে জানালে তিনি বুঝবেন আসলে সেটার ব্যাখ্যা কী।



বড়রা যেভাবে ঈদ করতেন

নাঈম আবু বকর

আমাদের বড় কারা? সব বড় আমাদের কাছে বড় নয়। আমরা বড় বলে বরণ করি তাদের, যারা দীনের কাজে আমাদের আদর্শ; যাদের দেখে আমরা পরিশুদ্ধ হই, পথচলার সম্বল পাই। প্রিয়নবি সা., সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন ও যুগ-যুগের বুজুর্গ মনীষীরাই আমাদের বড়, আমরা তাদের আকাবির বলে স্মরণ করি।

আমাদের বড়দের মতো মহান কাফেলা ইতিহাসে বিরল। তাদের চরিত্র-সুষমা, সততা-মহিমা আর সাধনা-কারিশমা সত্যিই নজিরবিহীন। আমাদের তারা গর্ব। তাদের জীবন, তাদের পদচিহ্ন আমাদের পথ দেখায়। আমরা তাদের মতো হতে চাই। কোনো কাজ তারা যেভাবে করেছেন, আমরা সেভাবেই করতে চাই। আমাদের বিশ্বাস, তাদের পথ ধরে হেঁটে গেলে আমরা পথ হারাবো না।

মহান মনীষীদের জীবনের অনেক বিষয় নিয়েই বিস্তর গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। তাদের জীবনের বহু খুঁটিনাটি ঐতিহাসিকরা লিখে গেছেন। আল্লামা জাহাবি, খতিব বাগদাদি, ইবনে খাল্লিকান বা ইবনে আসাকিরের মতো ইতিহাসবিদদের বৃহৎ কলেবরের কিতাবগুলো মনীষীদের জীবনের নানা কাহিনিতে ভরপুর। এসব কিতাবে অনুসন্ধান চালালে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের আদর্শ স্পষ্ট হয়। গবেষকরা নিয়মিতই তাদের জীবনী বিশ্লেষণ করে যাচ্ছেন।

ঈদের মতো একটি ইসলামি সামাজিক অনুষ্ঠান মনীষীরা কীভাবে পালন করতেন- এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কিন্তু সত্য হলো, তাদের ঈদপালনের রীতিনীতি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা আমাদের জানামতে এখনও হয়নি। হয়তো হবে; তবে আমরা বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান চালিয়েছি। সংক্ষিপ্ত এই অনুসন্ধানে তাদের ঈদপালনের বিশেষ কয়েকটি রীতি স্পষ্ট হয়েছে। সেগুলো হলো- ১. একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় ২. ভালো পোশাক পরিধান ৩. ঈদ উপলক্ষে ভালো খাবারের আয়োজন ৪. একে অপরকে নিমন্ত্রণ ৫. প্রচুর দান-সদকা ও অন্যকে সহযোগিতা ৬. ঈদের আনন্দ প্রকাশকরণ ৭. ঈদের দিনেও ইবাদতে আগ্রহ ইত্যাদি।

প্রত্যেকটি বিষয়ের পক্ষে দুয়েকটি বর্ণনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঈদে একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময়

আল্লামা মাহামিলি একজন বড়মাপের মুহাদ্দিস। পুরো নাম হুসাইন বিন ইসমাইল। একাধারে মুহাদ্দিস ও বিচারক। থাকতেন বাগদাদে। ৩৩০ হিজরিতে তার মৃত্যু। আল্লামা মাহামিলি একবার ঈদে সে যুগের প্রসিদ্ধ আলিম দাউদ জাহিরি রহ.-কে শুভেচ্ছা জানাতে গেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। মাহামিলি রহ. বলেন, 'এক ঈদুল ফিতরের দিন আমি শহরের জামে মসজিদে ঈদের নামাজ পড়লাম। নামাজের পর ইচ্ছে হল, দাউদ বিন আলির (দাউদ জাহিরি) কাছে গিয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি কাতিয়াতুর রবি এলাকায় থাকতেন। তার বাড়িতে গেলাম। দেখলাম, খুবই নগণ্য কিছু খাবার খাচ্ছেন তিনি! আমি তাকে শুভেচ্ছা জানালাম এবং তার অবস্থা দেখে অবাক হলাম।' (ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান : ২/২৫৫)

এই ঘটনা থেকে ঈদে ভালো খাবারের বিষয়টিও স্পষ্ট হয়। দাউদ জাহিরিকে সাধারণ খাবার খেতে দেখে মাহামিলি রহ. অবাক হয়েছেন। তবে দাউদ জাহিরি দরিদ্র হলেও কারও সহযোগিতা নিতে চাইতেন না। উল্লিখিত বর্ণনায়ও ঈদ উপলক্ষে প্রতিবেশীর দেয়া বিরাট অংকের সাহায্য তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন বলে উল্লেখ রয়েছে।

ভালো পোশাক পরা

ইসলামে ঈদে নতুন পোশাক পরার বাধ্যবাধকতা নেই, তবে সাধ্যের মধ্যে উন্নত পোশাক পরা মুস্তাহাব। বড়দের যুগে ঈদের বিশেষ পোশাকের গুরুত্ব ছিলো বলে বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। বিখ্যাত স্বপ্নের তাবির-বিশারদ ইমাম ইবনে সিরিনের নাম সবারই জানা। তখনকার যুগে কাপড় কিনে নিজের ইচ্ছেমতো রঙ করানোর প্রচলন ছিলো। ইবনে সিরিন রহ.-এর মা কাপড়ে রঙ করানো খুব পছন্দ করতেন। মায়ের জন্য ইবনে সিরিন রহ. কাপড় কিনতেন; এরপর ঈদ এলে তাতে রঙ করাতেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৮/১৯৫)

হজরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. ঈদের দিন নিজ সংগ্রহে থাকা রাসুলুল্লাহ সা.-এর ব্যবহৃত একটি চাদর পরতেন। (প্রাগুক্ত : ৯/১৫৫)

এবার কাজি ওয়াকিদি রহ.-এর জবানিতে তার নিজের এক অবিশ্বাস্য কাহিনি শুনুন। এই ঘটনায় ঈদে ভালো পোশাকের বিষয় যেমন উঠে আসে, তেমনি পরস্পর সহমর্মিতারও অনন্য উদাহরণ ফুটে ওঠে। ওয়াকিদি বলেন, একবার আমি খুব অভাবে ছিলাম। ওদিকে ঈদ চলে এলো। আমার স্ত্রী বললেন, 'আমরা না-হয় ধৈর্য ধরে কোনোমতে ঈদ কাটিয়ে দিলাম, কিন্তু বাচ্চারা তো বোঝে না। ওরা ঈদের দিন আশপাশের শিশুদের সাজসজ্জা করতে দেখবে, ভালো পোশাক পরতে দেখবে; আর নিজেরা এই মলিন কাপড় পরে থাকবে? একটু দেখুন না, ওদের কাপড়ের জন্য কিছু অর্থের ব্যবস্থা করা যায় কি না!'

একথা শুনে আমি আমার এক হাশেমি বন্ধুর কাছে চিঠি লিখে সাহায্য চাইলাম। তিনি আমার কাছে একটি থলে পাঠালেন। জানালেন, তাতে একহাজার দিনার আছে। সবেমাত্র থলেটি পেয়েছি, এমন সময় আমার আরেক বন্ধুর চিঠি এলো। তিনি সমস্যায় আছেন, সাহায্য প্রয়োজন। আমি থলে খুলেও দেখিনি, সেভাবেই তার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। সে-রাতে আমি লজ্জায় ঘরে গেলাম না, এক মসজিদে রাত কাটালাম। পরে অবশ্য স্ত্রী আমার ঘটনা শুনে মোটেও মন খারাপ করেননি, উল্টো আমার কাজের প্রশংসা করেছেন।

এদিকে হঠাৎ আমার হাশেমি বন্ধু হাজির, হাতে সেই থলেটি। আমাকে বললেন, 'সত্য করে বলো, আমি তোমাকে যে থলে দিয়েছিলাম, সেটা কী করেছো?'

আমি তাকে পুরো ঘটনা জানালাম। এবার বন্ধু বলেন, 'তুমি যখন আমার কাছে সহযোগিতা চেয়েছো, আমার কাছে ওই একহাজার দিনারই ছিলো। সেটা তোমার কাছে পাঠিয়ে আমি ওই বন্ধুর কাছে চিঠি লিখেছিলাম। সে আমার কাছে সাহায্য পাঠালো, দেখি, হুবহু আমার থলেটিই পাঠিয়েছে। তাই তোমার কাছে ঘটনা জানতে এসেছি।'

ওয়াকিদি বলেন, 'এরপর আমরা তিন বন্ধু ওই দিনার ভাগ করে নিলাম। বিশেষ উদার মনোভাবের পুরস্কারস্বরূপ আমার স্ত্রীকে দেয়া হলো একশ দিনার। খলিফা মামুন এই ঘটনা জানতে পেরে আমাদের প্রত্যেককে দুইহাজার দিনার করে তোহফা দিয়েছিলেন। আমার স্ত্রীকেও দিয়েছিলেন একহাজার দিনার।' (ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান: ৪/৩৪৯-৩৫০)

এমন ঘটনা পড়ে শুধু নির্বাক হওয়া ছাড়া আর কী করা যায়!

ঈদ উপলক্ষে ভালো খাবার

আবু বকর মুহাম্মদ বিন মুসলিম কানতারি রহ. অনেক বড় বুজুর্গ ছিলেন। দুনিয়াবিরাগ ও তাকওয়ায় তাকে প্রখ্যাত বুজুর্গ বিশর হাফির সাথে তুলনা করা হতো। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর বিখ্যাত ছাত্র আবু বকর মাররুজি রহ. বলেন, 'আমি এক ঈদের দিন আবু বকর কানতারির কাছে গেলাম। দেখি, তিনি তালিযুক্ত- তবে পরিষ্কার কোর্তা পরে আছেন। সামনে কিছু খারনুব (শিম-জাতীয় সবজি) রাখা, সেগুলো খাচ্ছেন। আমি বললাম, 'আজ ঈদের দিন আর আপনি খারনুব খাচ্ছেন!'

তিনি বললেন, 'এটা দেখো না, বরং চিন্তা করো, আল্লাহ যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, খারনুব কোথায় পেয়েছিলে, তবে কী উত্তর দেবো!' (তারিখে বাগদাদ : ১২/১৯)

আবু বকর মাররুজির প্রশ্নে জানা গেল, ঈদে ভালো খাবারের গুরুত্ব তাদের কাছে ছিল। পূর্বে উল্লিখিত দাউদ জাহিরি রহ.-এর ঘটনাটিও এখানে স্মরণযোগ্য।

ঈদে একে অপরকে নিমন্ত্রণ

এক মজজুব-ধরনের আশ্চর্য বুজুর্গের ঘটনা। ইবনে দাহহাক বলেন, 'আমি তিলমিসান শহরে গিয়েছিলাম। সেখানে এক খাটো লোককে দেখতাম- কুলিগিরি করতো। সে কখনও কারও সামনে নামাজ পড়তো না। একদিন আমি তাকে নামাজ পড়তে দেখে ফেলি। আমাকে দেখেই সে নামাজ ছেড়ে এটা-সেটা করতে লাগলো। ইতোমধ্যে ঈদের দিন চলে এলো। লোকটিকে ঈদগাহে পেয়ে মনে মনে ভাবলাম, তাকে ঘরে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করাবো। কিন্তু হলো

উল্টোটা; সে-ই আগে দাওয়াত দিয়ে ফেললো আমাকে। তার সাথে গেলাম। সে আমাকে ঈদের বিশেষ খাবার খাওয়ালো।' (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৪৩/৩৪৭)

পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, অদ্ভুত লোকটি ছিলেন ছদ্মবেশী বুজুর্গ; মানুষের সামনে বুজুর্গি প্রকাশ করতে চাইতেন না। ঈদের দিন অন্যকে দাওয়াত করে খাওয়ানোর রীতি এই ঘটনায় পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। তাছাড়া ঈদের বিশেষ খাবারের প্রচলন ছিলো- এটাও স্পষ্ট হয়। ঘটনাটির সময়কাল ঈদে একশ গোলাম আজাদ করতেন! (প্রাগুক্ত : ৭/১৫০)

মরক্কোর সুলতান আবু ইউসুফ মানসুর অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও মুজাহিদ শাসক ছিলেন। তার শাসনকাল ৫৮০ থেকে ৫৯৫ হিজরি পর্যন্ত। খৃস্টানদের দখলকৃত কয়েকটি এলাকা তার আমলে পুনরায় জয় হয়েছে। দ্বীনের ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। সুলতান মানসুর এক ঈদে সত্তর হাজারেরও বেশি বকরি দান করেছিলেন। (আলআ'লাম: ৮/১৯৯, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ২১/৩১৭)

মরক্কোর সুলতান আবু ইউসুফ মানসুর অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও মুজাহিদ শাসক ছিলেন। তার শাসনকাল ৫৮০ থেকে ৫৯৫ হিজরি পর্যন্ত। খৃস্টানদের দখলকৃত কয়েকটি এলাকা তার আমলে পুনরায় জয় হয়েছে। দ্বীনের ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। সুলতান মানসুর এক ঈদে সত্তর হাজারেরও বেশি বকরি দান করেছিলেন।

আনুমানিক হিজরি পাঁচ শতক।

ইবনে আবদাহ আল-আব্বাদানি হিজরি তিন শতকের একজন মুহাদ্দিস ও বিচারক। ঈদের দিন তিনি বিরাট দাওয়াতের ব্যবস্থা করতেন, যাতে গণ্যমান্য প্রায় সবাই উপস্থিত হতেন। (প্রাগুক্ত : ২৭/৪৬৬)

ঈদে দান-সদকা ও সহযোগিতা

ঈদে উন্নত পোশাক ও ভালো খাবারের গুরুত্ব যেহেতু আছে, তাই ঈদের অতিরিক্ত খরচ থাকাই স্বাভাবিক। মূলত সবাইকে যথাযথ ঈদপালনের সুযোগ দেয়াই ঈদে দান-সদকার মূল লক্ষ্য। ইসলামে ঈদুল ফিতরে সাদাকায়ে ফিতরের বিধান যেমন রয়েছে, তেমনি কুরবানির ঈদে রয়েছে কুরবানির গোশত দান করার উৎসাহ। শুধু কর্তব্যটুকু নয়, ঈদ উপলক্ষে মনীষীরা বরং সাধ্যমতোই দান করতেন।

সাহাবি হজরত আবু বাকরাহ রাযি.-এর পুত্র উবাইদুল্লাহ বিন আবু বাকরাহ সিজিস্তানের গভর্নর ছিলেন। তিনি প্রতি ঈদে একশ গোলাম আজাদ করতেন!

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর বিশেষ উস্তাদ হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান রমজান মাসে পাঁচশ লোককে ইফতার করাতেন এবং ঈদের পর (সম্ভবত ঈদ আসার পর অর্থাৎ ঈদে) তাদের প্রত্যেককে একশ দেরহাম করে দিতেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৯/২৭০)

ঈদে আনন্দ প্রকাশ করা

হজরত আয়েশা রাযি.-এর বর্ণনা, একবার কুরবানির ঈদের কোনো এক দিন হজরত আবু বকর রাযি. তার ঘরে গেলেন। ঘরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামও ছিলেন। তিনি একটি কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। সেখানে তখন দুটি ছোট্ট মেয়ে গান গাইছিলো আর দফ (একধরণের বৈধ ধ্বনিযন্ত্র) বাজাচ্ছিলো। রাসুলুল্লাহ সা. তাদেরকে কিছুই বলছিলেন না। আদেশও করছিলেন না, নিষেধও না। হজরত আবু বকর রাযি. মেয়ে দুটিকে নিষেধ করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সা. চেহারা থেকে কাপড় সরালেন। বললেন, 'ওদের ছেড়ে দাও, আবু বকর; এই দিনগুলো তো ঈদের দিন!' (বুখারি : ৯৮৭, সংযোজন- তারিখে দিমাশক : ৮/১২১)

ঈদে জায়েজ উপায়ে আনন্দ প্রকাশ করতে বাধা নেই। ইসলাম ঈদে আনন্দই চায়। ঈদের দিনগুলোতে তাই রোজা রাখা হারাম। এগুলো ইসলামের মানবিক বোধের দৃষ্টান্ত। ইসলাম মানুষের আপন ধর্ম, জবরদস্তিমূলক কোনো পুলিশি বিধান নয়।

ঈদেও ইবাদতের আগ্রহ

আমাদের মনীষীদের স্বাতন্ত্র্য এখানেই- তারা কোনো ব্যস্ততায়ই আল্লাহকে ভুলেননি। যত আনন্দের উপলক্ষই হোক, ইবাদতে তাদের মনোযোগের কমতি হয়নি। হজরত আবু বকর রাযি.-এর জমানার কথা। হজরত আনাস রাযি. বলেন, 'একবার ঈদের দিন আবু বকর রাযি. নামাজে সুরা বাকারা শুরু করলেন। আমি ভাবলাম, দশ আয়াত পড়বেন। যখন দশ আয়াত পার হয়ে গেলো, ভাবলাম, একশ আয়াত পড়বেন। এভাবে তিনি পুরো সুরাই শেষ করে ফেললেন!' (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ২৫/২২৬)

ঈদের দিন গুনাহের কাজ হলে ঈদের তাৎপর্য হারিয়ে যায়। প্রখ্যাত বুজুর্গ হাসান বসরি রহ. বলেছেন, 'যেদিন আল্লাহর নাফরমানি করা হয় না, সেদিনই প্রকৃত ঈদ।' (লাতায়িফুল মাআরিফ : ২৯৯)

ওয়াকি রহ. বলেন, 'এক ঈদের দিন আমরা সুফিয়ান সাওরি রহ.-এর সাথে বের হলাম। তিনি বললেন, 'আজ আমাদের প্রথম কাজ দৃষ্টি নত রাখা।' (আল-ওয়ারা', ইবনু আবিদ্দুনিয়া : ৬৬)

ঈদ একটি ইসলামি উৎসব। তাকে ইসলামের বিধানমতো পালন করাই সচেতন মুসলমানের কর্তব্য। বড়দের এসব ঘটনায় ঈদপালনের ইসলামি পদ্ধতি স্পষ্ট হয়। আল্লাহ আমাদেরকে আকাবিরের পথে চলার তাওফিক দিন। এমন মনীষীদের পেয়ে আমরা সত্যিই ভাগ্যবান। আমরা এই নেয়ামতের শুকরিয়া জানাই।



অতুলনীয় ফজিলতের মাস রমজান। পুরো মাসজুড়েই দিনের বেলা সিয়াম সাধনায় মগ্ন থাকেন আল্লাহপ্রেমিক মুসলমান। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম রমজানের এই সিয়াম সাধনা। সারা বছরে এই একটি মাসেই রোজা রাখা ফরজ। বিরামহীন একমাসের কঠোর এ সাধনার পর যখন আকাশে নতুন চাঁদ ওঠে, রোজাদার মুসলমানগণ তখন তাদের সিয়াম সাধনার একটি পুরস্কার লাভ করে।

রমজানের পরবর্তী মাসটি হচ্ছে শাওয়াল। আর শাওয়ালের প্রথম তারিখই হচ্ছে ঈদুল ফিতর। রমজানের প্রতিটি দিন যেমন রোজা রাখা ফরজ, নারী-পুরুষ ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলের জন্যে এ বিধান শিরোধার্য, তেমনি এ ঈদুল ফিতরের আনন্দও সর্বজনীন, এদিন সকলের জন্যেই রোজা রাখা হারাম।

রমজানের ফরজ রোজাকে এভাবেই অন্যান্য দিনের রোজা থেকে পৃথক করা হয়েছে। ঈদুল ফিতরের দিনটি রোজাদারের জন্যে পুরস্কারস্বরূপ—এ কথা ঠিক, পাশাপাশি এ বিধানের মধ্য দিয়ে ফরজ ও নফল রোজা মিশে যাওয়ার আশংকাও দূর হয়েছে।

কিন্তু যে অনন্য মহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকে পবিত্র মাহে রমজান, অতুলনীয় যে ফজিলতকে তা ধারণ করে রাখে, পরের মাস শাওয়ালের চাঁদ ওঠার সাথে সাথেই কি তা একেবারে শেষ হয়ে যাবে? মহামহিম আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অনুগত বান্দাদের জন্যে ব্যবস্থা ঠিক এরকম নয়। শাওয়ালের প্রথম তারিখ ঈদুল ফিতরের দিন রোজাকে নিষিদ্ধ করে রমজানের অনন্যতাকে একদিকে অধিক স্পষ্ট করা হয়েছে, অপরদিকে ঈদের পরদিন থেকেই পুরো মাসজুড়ে ঐচ্ছিকভাবে আরেকটি ফজিলতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সহিহ মুসলিম শরিফের বর্ণনা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

'যে রমজান মাসের রোজা রাখলো, এরপর শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখলো, সে যেন পুরো বছরই রোজা রাখলো।' [হাদিস নং ১১৬৪]

যে কোনো ভালো কাজ করলে দশগুণ নেকি পাওয়া যায়–এটি কুরআনের ঘোষণা। সুরা আনআমে আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ–

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

'যে কেউ কোনো ভালো কাজ করবে, সে এর দশগুণ নেকি লাভ করবে।' [আয়াত : ১৬০]

রমজানের ত্রিশটি রোজা রাখার পর শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখলে মোট রোজার সংখ্যা দাঁড়ায় ছত্রিশটি। আর ছত্রিশটি রোজার দশগুণ হচ্ছে তিনশ ষাটটি রোজা। এ অর্থেই শাওয়ালের ছয় রোজার মাধ্যমে পুরো বছরের রোজা রাখার সওয়াব পাওয়া যায়। হাদিসের ভাষ্য থেকে এটাও স্পষ্ট, শাওয়ালের ছয় রোজা দিয়ে পুরো বছরের রোজার নেকি হাসিল করতে হলে অবশ্যই রমজানের পুরো মাস রোজা রাখতে হবে। রমজানের রোজা না রেখে, কিংবা কিছু রেখে কিছু না রেখে শাওয়ালের রোজা রাখলে এ ফজিলত পাওয়া যাবে না। রমজান মাস যদি উনত্রিশ দিনে শেষ হয়ে যায়, তবু এ সওয়াব প্রাপ্তির জন্যে শাওয়ালের ছয়টি রোজাই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে এমনটি মনে করার অবকাশ নেই, রমজান মাস উনত্রিশ দিনে শেষ হলে হয়তো শাওয়াল মাসে সাতটি রোজা রাখতে হবে। কারণ হাদীসে স্পষ্টভাবেই রমজান মাসের রোজা রাখার পর শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখার কথা বলা হয়েছে। রমজান মাস ত্রিশ দিনে শেষ হলো না উনত্রিশ দিনে–তা এক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়।

এ ছয়টি রোজা কীভাবে রাখতে হবে– বিরতিহীনভাবে না

বিরতি দিয়ে দিয়ে? ঈদুল ফিতরের পরপর, না মাসের শেষদিকে? না মাসের মাঝের দিনগুলোতে? এসব বিষয়ে হাদিস বিশারদ মনীষীগণের পক্ষ থেকে সবরকম মতই বর্ণিত হয়েছে। কেউ বলেছেন, মাসের শুরুর দিকে বিরতিহীনভাবে এ ছয় রোজা রাখা উত্তম। কারণ এতে একটি কল্যাণকর কাজ দ্রুত সম্পাদিত হবে। আবার কেউ বলেছেন, শেষদিকে কিংবা বিরতি দিয়ে দিয়ে রোজাগুলো রাখা উত্তম হবে। কেননা এতে রমজানের ফরজ রোজার সাথে এ নফল রোজার একটি পার্থক্য স্পষ্টরূপে ফুটে উঠবে। মোটকথা, এ রোজাগুলো যেভাবেই রাখা হোক, মাসের যে সময়েই রাখা হোক, হাদিসে বর্ণিত এ সওয়াব পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। অনেকে অবশ্য বিরতিহীনভাবে এ ছয় রোজা রাখাকে জরুরি মনে করে থাকে, এ ধারণাটি ঠিক নয়।

আরও কয়েকটি নফল রোজা

ঈদুল ফিতরের মধ্য দিয়ে মাসব্যাপী সিয়ামসাধনার সমাপ্তি ঘটে– এ কথা ঠিক। কিন্তু এর চেতনা ও শিক্ষা একজন মুমিন বাকি এগারটি মাস মনেপ্রাণে ধারণ করে। শুধু তাই নয়, হাদিস শরিফে এমন আরও কিছু রোজার কথা বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো সওয়াব ও পুরস্কারপ্রাপ্তির দিক দিয়ে সারা বছরের রোজা রাখার সমতুল্য। কিছু রোজা আবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বছরজুড়ে নির্দিষ্ট সময়ে রাখতেন। এখানে আমরা এমনই দুটি বিষয় উল্লেখ করছি।

প্রতি মাসে তিন রোজা

রমজানের পর থেকে আবার রমজান আসা পর্যন্ত প্রতি আরবি মাসে তিনটি রোজা রাখা সুন্নত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত এ রোজা রাখতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও এ বিষয়ে উৎসাহিত করতেন। উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা রা. বলেছেন, হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি বিষয় কখনো ছাড়তেন না- ১. আশুরার রোজা, ২. জিলহজের প্রথম দশকের রোজা, ৩. প্রতি মাসে তিন রোজা আর ৪. ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজ। [সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ২৪১৬] সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. আমলের প্রতি অত্যধিক উৎসাহী ছিলেন তিনি। বছরজুড়ে রোজা রাখতেন আর রাতভর তাহাজ্জুদ নামাজে কুরআন শরিফ পড়ে পড়ে কাটিয়ে দিতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন তাকে এ থেকে বারণ করলেন আর বললেন,

لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ

'যে সারা বছর রোজা রাখে, তার রোজাই হয় না। (প্রতি মাসে) তিনটি রোজাই পুরো বছরের রোজার সমতুল্য।' [সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৯৭৯]
শাওয়ালের ছয় রোজার মতো এখানেও দশগুণ নেকির বিষয়টিই বিবেচ্য। তিন দিন রোজা রাখলে এর দশগুণ হিসেবে ত্রিশটি অর্থাৎ পুরো মাস রোজা রাখার সওয়াব মিলে। আর এভাবে যে বছরের প্রতিটি মাসে রোজা রাখবে, সে যেন পুরো বছরই রোজা রাখলো। এই অর্থেই উপরোক্ত হাদীসে প্রতি মাসে তিনটি রোজাকে সারা বছরের রোজার সমতুল্য বলা হয়েছে।
এ তিনটি রোজা মাসের কোন তারিখে রাখতে হবে—এ নিয়ে অবশ্য কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। মাসের শুরুতে মাঝে শেষে—যে কোনো সময়ই তা রাখা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো তারিখ নির্দিষ্ট করে এ রোজা রাখতেন না। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এমনটিই বলেছেন—'রোজাগুলো মাসের কোন তারিখে হচ্ছে এ নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো ভাবনা ছিলো না।' [সহিহ মুসলিম] তবে হাদিস শরিফে এও পাওয়া যায়, তিনি কোনো কোনো সাহাবিকে কখনো প্রতি আরবি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোজা রাখার জন্যে উৎসাহিত করেছেন। সহিহ বুখারির বর্ণনা, হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, আমার বন্ধু হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখতে আদেশ করেছেন। [হাদিস : ১৯৮১]
ইমাম বুখারি রহ.-এর ব্যাখ্যা অনুসারে, এ তিন দিন হলো প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ। এ তিন দিন রোজা রাখাও সুন্নত। পরিভাষায় এ তিন দিনকে 'আয়্যামে বিজ' বলা হয়। তাই যদি কেউ প্রতি মাসের এ তিন দিন রোজা রাখে, তাহলে আয়্যামে বিজের রোজার সুন্নতও আদায় হবে, আবার মাসে তিন দিন রোজা রাখার সুন্নতও পালিত হবে। আর এর মধ্য দিয়ে খুব সহজেই অর্জিত হতে পারে পুরো বছরের নফল রোজার সওয়াব।

প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারের রোজা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়মিত আমল ছিলো– তিনি প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন। সাহাবি হজরত উসামা ইবনে জায়েদ রা. তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি যখন রোজা রাখতে শুরু করেন তখন এমন হয় যেন আপনি আর রোজা ছাড়বেন না। আবার যখন রোজা না রাখতে শুরু করেন, তখন মনে হয় যেন আপনি আর রোজা রাখবেন না। কিন্তু দুইটি দিনের কথা ভিন্ন। সে দুইটি দিন অবশ্য আপনি নিয়মিতই রোজা রাখেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কোন দুই দিন? সাহাবি বললেন, সোম ও বৃহস্পতিবার। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

'এই দুই দিন (মানুষের) আমল বিশ্বজগতের প্রভুর সামনে উপস্থিত করা হয়। আমার ইচ্ছা, আমার আমলগুলো যখন তাঁর নিকট পেশ করা হয় তখন যেন আমি রোজা অবস্থায় থাকি।' [সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ২৩৫৮]
সপ্তাহের এ দুই দিন এবং আয়্যামে বিযের তিন দিনেও শাওয়ালের ছয় রোজা রাখা যেতে পারে। প্রয়োজন কেবল একটু সচেতনতা। এতে একটি আমলের মধ্য দিয়েই তিনটি আমল পালিত হতে পারে খুব সহজেই। আল্লাহর ভাণ্ডারে যে সবকিছুই অসীম! করুণাময় সেই সত্তার নিকট আমরা সবকিছুর প্রতিদানই আশা করতে পারি।

সাক্ষাৎকার

পড়াচ্ছেন মেয়েদের মতো, পরীক্ষা নিচ্ছেন ছেলেদের নিয়মে একই প্রশ্নে– এটা চরম অবিচার

মহিলা মাদরাসা। বাংলাদেশে এ ধারার মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শিক্ষাব্যবস্থাটি নানামুখী আলোচনা-সমালোচনা আর অভিযোগ-আশাবাদের জন্ম দিয়েছে, যা এখনো অব্যাহত। এসব কিছুর পরও এই ধারার শিক্ষাব্যবস্থা এগিয়ে চলেছে। বাড়ছে মাদরাসা বাড়ছে ছাত্রীসংখ্যা। বাড়ছে মানুষের কৌতূহলও। এইসব সমালোচনা আলোচনা, অভিযোগ-আশাবাদ আর কৌতূহল নিয়ে এক বিকেলে আলোচনায় বসেছিলাম মহিলা মাদরাসার ঐতিহ্যবাহী ও পুরনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খাদীজাতুল কুবরা (রা.) মাদরাসা, খুলনা-এর শিক্ষাসচিব আলেমা **সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না**-এর সাথে। বয়সে নবীন হলেও মেধাবী এই আলেমা প্রশ্নের বাণ সামলেছেন প্রজ্ঞার সাথেই। তার কথায় উঠে এসেছে মহিলা মাদরাসা সম্পর্কে স্পষ্ট ও সত্য উচ্চারণ। তার সঙ্গে আলাপচারিতায় ছিলাম আমরা দু'জন–

আলেমা নাঈমা তামান্না ও **আলেমা আফিফা মারজানা**

মহিলাকণ্ঠ : আসসালামু আলায়কুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ!

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : ওয়ালাইকুম সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ!

মহিলাকণ্ঠ : প্রথমে ব্যক্তিগত বিষয় দিয়ে শুরু করি। আপনি কোন মাদরাসা থেকে এবং কত সালে আলেমা হয়েছেন?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : আমি আল জামিয়াতুল আরাবিয়া খাদিজাতুল কুবরা, শেখপাড়া, খুলনা থেকে দাওরায়ে হাদিস শেষ করে আলেমা হই।

মহিলাকণ্ঠ : কতোদিন থেকে মাদরাসা শিক্ষকতা করছেন?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : আলহামদুলিল্লাহ চার বছর ধরে।

মহিলাকণ্ঠ : আমাদের সমাজে তো সাধারণ শিক্ষাটাই সহজলভ্য। সেটা বাদ দিয়ে মাদরাসায় পড়ার কারণ কী?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : প্রাথমিক অবস্থায় যখন ছোট ছিলাম তখন তো আর দীন-শরিয়ত বুঝতাম না। বাবা-মা ধার্মিক ছিলেন। সেই সুবাদে শিক্ষাজীবনের শুরুটাই হয়েছে মাদরাসা থেকে। এরপর যখন ধীরে ধীরে আমি নিজেই বুঝতে শিখলাম তখন তো আর স্কুলে যাওয়ার চিন্তাই আসেনি। কেননা তখন আমার ভেতরেই ইসলাম এবং ইসলামি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এবং ভালোবাসা জন্মে গেছে।

মহিলাকণ্ঠ : পারিবারিক শিক্ষা অর্থাৎ আপনার পরিবারের শিক্ষাগত অবস্থাটা কেমন?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : আমার আব্বু-আম্মু যদিও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত, তবে আলহামদুলিল্লাহ আমরা চারজন ভাইবোন সবাই কওমি মাদরাসার শিক্ষার সঙ্গে জড়িত।

মহিলাকণ্ঠ : আপনার পরিবাবের অন্যান্য সদস্য যেমন চাচা-মামা, তারা?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : নানাবাড়ির সবাই কওমি

মাদরাসার সাথে জড়িত, সবাই হাফেজ আলেম। আর দাদাবাড়ির আমার এক ফুফু কওমিপড়ুয়া শুধু।

মহিলাকণ্ঠ : দাদাবাড়ি এবং নানাবাড়ির পরিবেশের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে? ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনে?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : হ্যাঁ, দীনি বিষয়ে কিছুটা পার্থক্য আছে। তবে আমার দাদা আলেম না হলেও দীনি বিষয়ে কঠোর ছিলেন। যার কারণে চাচারা আলেম না হলেও ইসলামি রীতিনীতি পালনে সর্বদাই আগ্রহী ছিলেন।

মহিলাকণ্ঠ : বর্তমানে কোথায় শিক্ষকতা করছেন?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : আমার সৌভাগ্য যে আমি যে মাদরাসা থেকে আলেমা হয়েছি সে মাদরাসাতেই শিক্ষক হওয়ার সুযোগ পেয়েছি।

মহিলাকণ্ঠ : আপনার মাদরাসার ছাত্রীসংখ্যা কতো?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : বর্তমানে প্রায় সাড়ে আটশো।

মহিলাকণ্ঠ : দিন দিন কি ছাত্রীসংখ্যা বাড়ছে না কমছে?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : কমার তো প্রশ্নই আসে না। ছাত্রীসংখ্যা দিনদিন বেড়েই চলছে; এমনকি আমাদের এখানে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় ভর্তিচ্ছু অনেক ছাত্রীকে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ফেরত যেতে হয়।

মহিলাকণ্ঠ : বর্তমানে স্কুল বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রীদের ইভটিজিংসহ বিভিন্ন শারিরীক, মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া যায়। এমন ঘটনা কি মহিলা মাদরাসার ছাত্রীদের ব্যাপারেও ঘটে থাকে। গার্ডিয়ানরা নিরাপত্তাবোধ করেন কি?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : এটা আমাদের জন্য একটা গর্বের বিষয় যে, এসব নির্যাতন ও অভিযোগ থেকে কওমি মাদরাসা সম্পূর্ণ মুক্ত। আর এখন পর্যন্ত আমি কোনোদিন শুনিনি কোনো মাদরাসার ছাত্রী ইভটিজিংয়ের শিকার হয়েছে।

মহিলাকণ্ঠ : এর কারণ কী?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : এটা তো খুবই সাধারণ একটি বিষয়। মুখ, হাত-পা ঢাকা বোরকা পরিহিত একজন মেয়েকে কোনো ছেলেই উত্যক্ত করবে না। কেননা বোরকাপরা মেয়েদের দিকে সমাজের সবাই শ্রদ্ধামিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকায়। কেউ তাদেরকে উত্যক্ত করবে তো দূরের কথা, তাদের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকায়ই না।

মহিলাকণ্ঠ : পুরুষ মাদরাসার চেয়ে মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা এবং ছাত্রী অংশগ্রহণে তুলনামূলকভাবে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এটাকে ইতিবাচক বলবেন নাকি নেতিবাচক?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : হ্যাঁ, অবশ্যই এটাকে আমি ইতিবাচক বলবো। কারণ মাদরাসাসংখ্যা যতো বাড়বে নারীদের শিক্ষাব্যবস্থা ততো প্রশস্ত হবে। ইসলাম নারীশিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। সুতরাং একটি সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ গঠনে মহিলা মাদরাসার বিকল্প কিছুই হতে পারে না।

মহিলাকণ্ঠ : এই যে মহিলা মাদরাসা এবং ছাত্রীসংখ্যা বেড়েই চলছে, এর কারণটা কী?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : এর কারণ আমি মনে করি সাধারণ মানুষ ইসলামি শিক্ষার গুরুত্বটা বুঝতে পারছে এবং নিরাপত্তা ও সার্বিক দিক বিবেচনায় তারা মহিলা মাদরাসার দিকে বেশি ঝুঁকছে। যদি এদের চাহিদা না থাকতো তাহলে তো আর পরিচালকরা শুধু শুধু প্রতিষ্ঠান খুলে বসে থাকতো না।

মহিলাকণ্ঠ : প্রায়শই অভিযোগ শোনা যায়, এতো অধিক পরিমাণ মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠার কারণ অনেকটা ব্যবসায়িক। কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন বিষয়টি?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : (কিছুক্ষণ ভেবে) আসলে শিক্ষাকে পুঁজি করে ব্যবসা করা, এটা কিন্তু খারাপ কিছু না। বরং বাংলাদেশসহ বহির্বিশ্বে পাবলিক ইউনিভার্সিটি থেকে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির সংখ্যা অনেক বেশি। সুতরাং যদি কেউ ব্যবসা করেও থাকে তাহলে দোষের কিছু আমি দেখছি না। তবে কওমি মাদরাসার ব্যাপারে এ অভিযোগটা অবশ্যই উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার বলা চলে। এমন দু-একটা প্রতিষ্ঠান যদি থেকেও থাকে সেটা খুব বিরল। সুতরাং মহিলা মাদরাসার ব্যাপারে সার্বিকভাবে বলা যাবে না যে এগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ব্যবসার উদ্দেশ্যে।

মহিলাকণ্ঠ : পুরুষ মাদরাসা পরিচালনা করতে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদের গলদঘর্ম হতে হয়। কারণ এসব মাদরাসায় ছাত্রদের ফ্রি থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু মহিলা মাদরাসায় চিত্রটি সম্পূর্ণ উল্টো। সেখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ছাত্রীদের আবাসন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ব্যবসায়িকভাবে নেয়ার এটা একটা মূল কারণ। কীভাবে দেখছেন বিষয়টি?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : আচ্ছা তার আগে আমার একটা প্রশ্ন, এই যে পুরুষ মাদরাসাগুলো পরিচালিত হচ্ছে; থাকা খাওয়া আবাসন খরচ, এই টাকাটা আসছে কোথা থেকে?

মহিলাকণ্ঠ : সাধারণ মানুষের দান থেকে।

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : কালেকশন, তাই তো? তা-ই যদি হয় তাহলে এখন আসুন মেয়েদের ব্যাপারে। মেয়েদেরকে দিয়ে কি কালেকশন, ধান-চাল বা টাকা-পয়সা সংগ্রহ করানো আদৌ সম্ভব? তাছাড়া ইসলাম নারীকে সর্বোচ্চ সম্মানে সমাসীন করেছে। বিয়ের আগে তার বাপ-ভাই ভরণ পোষণ দিবে, বিয়ের পর স্বামী। কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে শরিয়ত এমন জোর প্রয়োগ করেনি। তাই বৈধ পরিমাণ দান-সদকা, জাকাত ছেলেরা গ্রহণ করতে পারবে। সুতরাং মেয়েদের খোরপোষ বাপ-ভাই অথবা তার স্বামী বহন করবে, এটা মেয়েদের হক এবং তাদের সমাজ-শরিয়তি দায়িত্ব। আর তাছাড়া এটাকে আপনি ব্যবসা বলবেন কেমন করে? যে টাকা তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয় সেটা তো তাদের খাতেই ব্যয় করা হয় এবং এমন অনেক মহিলা মাদরাসা আছে যেখানে আর্থিক বিষয়ে ছাড় দেয়ার মাধ্যমে সাহায্য সহযোগিতা করা হচ্ছে। কিছু লোক বারবার কেন এসব মাদরাসাকে ব্যবসা বলে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাইছেন, আমার বুঝে আসে না।

মহিলাকণ্ঠ : পুরুষ শিক্ষক মহিলা মাদরাসার জন্য বরাবরই একটা প্রশ্নবিদ্ধ বিষয় হয়ে রয়েছে। এটা সমাধানের উপায় কী?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : দেখেন, আসলে প্রত্যেকটা বিষয়ই কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ। অর্থাৎ প্রত্যেকটা বিষয়েরই ভালো-মন্দ দুটো দিক থাকে। সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হবে ভালো দিকটাকে সামনে রেখে এগিয়ে যাওয়া এবং মন্দ দিকটা থেকে বেঁচে চলার উপায় বের করা। এখন আমার মনে হয় যে, আমরা যদি কয়েকটা পদক্ষেপ নিতে পারি তাহলে সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণ সম্ভব। যেমন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদক্ষেপ আমি বলি– এক. পরিচালনা পরিষদ : এটা যোগ্য এবং নিবেদিত হতে হবে, দুই. শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সেই

সাথে অবিবাহিত শিক্ষক নিয়োগ না দেয়া এবং তার দীনদারিত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল হতে হবে। সর্বোপরি মাদরাসার সাথে জড়িত সকলকেই এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে।

মহিলাকণ্ঠ : মাদরাসার সিলেবাসে কিছু মাসআলার কিতাব আছে যেগুলো নারী-পুরুষের স্পর্শকাতর শারীরিক বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়। যেমন কুদুরি, হেদায়া এগুলো কোনো পুরুষ শিক্ষককে দিয়ে পড়ানো আপনি কতোটা যুক্তিযুক্ত মনে করেন?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : আমি মনে করি যদি মাদরাসায় সেরকম যোগ্য শিক্ষিকা থাকে তাহলে এ সমস্ত কিতাব পুরুষদের না দেয়াটাই সবদিক থেকে ভালো।

মহিলাকণ্ঠ : আমার প্রশ্ন হলো যোগ্য শিক্ষিকা নেই কেন?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : মেয়েদের শিক্ষার প্রতি পুরুষদের এবং সমাজের একটা হীনমন্যতা কাজ করে। তারা মনে করে, মহিলারা এসব পড়াতে পারবে না। যার কারণে ধীরে ধীরে আমাদের নিজেদের ভেতরও এমন মনোভাব তৈরি হয়ে গেছে যে, আমরা পারবো না। এখানে আরেকটা কথা না বললেই নয়, মেয়েদেরকে পড়ানোর সময় এমন বিরূপ মনোভাব নিয়ে উস্তাযগণ দরস দিয়ে থাকেন, অনেকাংশে তাকরির করার ক্ষেত্রে তারা শুধুমাত্র মেয়ে বলে এড়িয়ে যান। এসব মনোভাব গোড়া থেকে মুক্ত না হলে আসলে আমাদের পক্ষে কিছু সম্ভব না। তবে আশার কথা হলো, এখন অনেক মাদরাসা আছে যেখানে মেয়েরা পূর্ণ দক্ষতার সাথে মেশকাত-দাওরার কিতাবও দরস দিচ্ছেন। এ থেকে বোঝা যায় আমরা হীনমন্যতা থেকে বেরিয়ে আসছি এবং অতিসত্বর মেয়েরা বোখারির দরসও দিবে।

মহিলাকণ্ঠ : মাদরাসাপাশ মেয়েরা বিয়ের পর সাংসারিক ব্যস্ততার কারণে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত হতে পারছেন না। এ কারণে মহিলা মাদরাসাগুলোতে নারী শিক্ষকদের অংশগ্রহণ এখনও তুলনামূলক অনেক কম। এ সমস্যা সমাধানের উপায় কী?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : কম কেথায়? যেমন আমাদের মাদরাসার কথাই বলি। এখানে সর্বমোট শিক্ষিকাসংখ্যা হলো বিশজন এবং পুরুষশিক্ষক হলেন আটজন। তারপরও কিছুটা তো কম আছেই। এজন্য কিন্তু মেয়েরা দায়ী না, পুরুষের মনোভাবই দায়ী। কারণ বিয়ের পর সে তার স্বামীর অধীনস্ত হয়ে পড়ে। স্বামী তাকে সে সুযোগ দিচ্ছে না বলেই তো সে খেদমতটা করতে পারছে না।

মহিলাকণ্ঠ : একটা মেয়ের জন্য কিন্তু তার স্বামী সংসার উপেক্ষা করে মাদরাসায় এসে পড়ে থাকা সম্ভব না। শরিয়তও এটাকে সমর্থন করে না। সে ক্ষেত্রে আপনি কী বলবেন?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : না, আমি কিন্তু বলছি না যে তাকে আবাসিক থেকেই পড়াতে হবে; বরং আমি বলবো পুরুষদের একটু সচেতন হতে হবে এবং স্ত্রীদের সুযোগ করে দিতে হবে। কারণ দিনে রাতে চব্বিশ ঘণ্টাই যে সংসারের কাজে ব্যয় করতে হয় এমন তো না। চব্বিশ ঘণ্টায় কম করে হলেও এক-দুই ঘণ্টা সে আশেপাশে কোনো মাদরাসায় গিয়ে দরস দিতে পারে। তাহলে এতে ক্ষতি কী? এদিকে আমাদের নারীশিক্ষিকার হারও বেড়ে গেলো, ওদিকে তার ইলমেরও চর্চা হলো।

মহিলাকণ্ঠ : ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি। মহিলা মাদরাসার শিক্ষার মান কি যথেষ্ট বা সন্তোষজনক বলে আপনার মনে হয়?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : এক্ষেত্রে ত্রুটি রয়েই গেছে আমাদের। এ বিষয়ে উন্নতি করার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি নিরলস এবং আশা করি ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটবে।

মহিলাকণ্ঠ : কওমি ছেলেদের ও মেয়েদের শিক্ষার মানে এতো ব্যবধান কেন? প্রায়শই ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ফলাফল বেশ খারাপ হচ্ছে। বিষয়টি কিভাবে দেখবেন?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : দেখুন একটা ছেলেকে বারো বছর পড়ানো হয়। আর একটা মেয়েকে আট বছর পড়িয়ে একই প্রশ্নে পরীক্ষা নিয়ে আপনি ফলাফলের তুলনা করতে পারেন না। যোগ্যতার চেয়ে বেশি জিনিস তার ওপর আপনি চাপিয়ে দিচ্ছেন। যেমন ধরুন দাওরার কথা। মেয়েরা ৮ বছর পড়ে পরীক্ষা দিচ্ছে আর ছেলেরা ১২ বছর পড়ে। আবার ধরুন মেশকাতে-জালালাইন পূর্ণ নেসাব একই বছরে শেষ করে মেয়েরা পরীক্ষা দিচ্ছে আর ছেলেরা একবছর জালালাইন পড়ে এসে পরবর্তী বছর তাফসিরে বায়জাভির কিছু অংশ পরীক্ষা দিচ্ছে। আবার দেখুন শরহে বেকায়ার মেয়েরা কুদুরি থেকে শরহে বেকায়ায় উঠে যাচ্ছে আর ছেলেরা মাঝে একটা জামাত বেশি পড়ছে। আপনি পড়াচ্ছেন মেয়েদের মত করে অথচ পরীক্ষা নিচ্ছেন সেই ছেলেদের নিয়মে একই প্রশ্নে। এটা আমি মনে করি একটা চরম অবিচার। বেফাকের উচিত এ বিষয়ে দ্রুত নতুন নিয়ম প্রবর্তন করা।

মহিলাকণ্ঠ : তার মানে আপনারা চার বছর কম পড়াচ্ছেন। পূর্ণ নেসাব পড়াতে সমস্যা কোথায়?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : কম পড়াতে চাই না তো! আমি তো এখানে প্রস্তাব পেশ করবো– মেয়েদের নেসাব আপনারা বড় করুন। ছেলেদের সিলেবাসের সমান করুন। সমস্যা কোথায়?

মহিলাকণ্ঠ : সমস্যা কিন্তু আছে। একটা ছেলে প্রায় নিশ্চিন্তে তার নেসাব পূর্ণ করে তাখাসসুস (উচ্চতর শিক্ষা) পাশ করে চাকরি-বাকরি, বিয়ে-শাদি করে ফেলে। কিন্তু মেয়েদের বেলায় দেখা যায়, প্রায়শই পড়ার মাঝে অনেকের বিয়ে হয়ে যায়। শরিয়তও মেয়েদের তাড়াতাড়ি, মানে ১৬-১৭ বছর বয়সে বিয়ে দেয়াকে জোর দেয়। অভিভাবকদেরও কর্তব্য তাকে সময়মতো বিয়ে দেয়া। এ সময়ের মধ্যে তার প্রয়োজনীয় ধর্মীয় জ্ঞানও অর্জন হয়ে যায়। সবদিক মিলিয়ে সাধারণভাবে মেয়েদের জন্য ১২ বছরের কোর্স শেষ করাটা কঠিন হয়ে যায় না?

মেয়েদের শিক্ষার প্রতি পুরুষদের এবং সমাজের একটা হীনমন্যতা কাজ করে। তারা মনে করে, মহিলারা এসব পড়াতে পারবে না। যার কারণে ধীরে ধীরে আমাদের নিজেদের ভেতরও এমন মনোভাব তৈরি হয়ে গেছে যে, আমরা পারবো না। এখানে আরেকটা কথা না বললেই নয়, মেয়েদেরকে পড়ানোর সময় এমন বিরূপ মনোভাব নিয়ে উস্তাযগণ দরস দিয়ে থাকেন, অনেকাংশে তাকরির করার ক্ষেত্রে তারা শুধুমাত্র মেয়ে বলে এড়িয়ে যান। এসব মনোভাব গোড়া থেকে মুক্ত না হলে আসলে আমাদের পক্ষে কিছু সম্ভব না।

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : বারো বছরের কোর্স যেহেতু মেয়েদের নানান সমস্যার কারণে করা যাচ্ছে না তাহলে ১২ বছরের কোর্সই আমাদের আট বছরের ভেতরে শেষ করতে হচ্ছে। তাহলে আমাদের পাশের হার বা ফলাফলের মান সমান হবে, এটা আমরা কখনোই আশা করতে পারি না। ঠিক আছে, যদি আমাদের প্রশ্নটা আমাদের আট বছরের মতোই করা হতো অর্থাৎ সব জামাতের প্রশ্ন আমাদের কোর্সের পড়া অনুযায়ী হতো, ছেলেদেরটা ওদের সিলেবাসমতো হতো এবং তখন যদি আমাদের পাশের হারটা কমে যেতো তাহলে একটা অভিযোগ বা আপত্তি করার সুযোগ থাকতো। এমতাবস্থায় এখানে আপত্তি তোলার অবকাশ নেই। এরকম না হলে এরপর আর কোনো কথাই থাকতে পারে না। আর পাশের হার তো খুব বেশি কমও না। গতবছর বেফাকে ছেলেদের পাশের হার ৭৯% আর মেয়েদের ৭২%। সার্বিক দিক বিবেচনা করলে এটাকে আপনি খারাপ বলতে পারবেন না। খুব তো কম-বেশি দেখতে পাচ্ছি না। সর্বসাকুল্যে ৭%। আমি তো মনে করি তিনভাগের একভাগ কম পড়ে আমরা যথেষ্ট ভালো পরীক্ষা দিচ্ছি। এমন ফলাফলের কারণে মহিলা মাদরাসার মেয়েরা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

মহিলাকণ্ঠ : বর্তমান যে নেসাবে পড়া চলছে সেটাকে কতোটুকু যুগোপযোগী মনে করেন? এতে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : হ্যাঁ অবশ্যই। ইংরেজি ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছু বই, কম্পিউটার শিক্ষা- এসব কিছু বিষয়ে জোর দেয়া প্রয়োজন।

যদি আমাদের প্রশ্নটা আমাদের আট বছরের মতোই করা হতো অর্থাৎ সব জামাতের প্রশ্ন আমাদের কোর্সের পড়া অনুযায়ী হতো, ছেলেদেরটা ওদের সিলেবাসমতো হতো এবং তখন যদি আমাদের পাশের হারটা কমে যেতো তাহলে একটা অভিযোগ বা আপত্তি করার সুযোগ থাকতো। এমতাবস্থায় এখানে আপত্তি তোলার অবকাশ নেই। এরকম না হলে এরপর আর কোনো কথাই থাকতে পারে না। আর পাশের হার তো খুব বেশি কমও না। গতবছর বেফাকে ছেলেদের পাশের হার ৭৯% আর মেয়েদের ৭২%। সার্বিক দিক বিবেচনা করলে এটাকে আপনি খারাপ বলতে পারবেন না। খুব তো কম-বেশি দেখতে পাচ্ছি না। সর্বসাকুল্যে ৭%। আমি তো মনে করি তিনভাগের একভাগ কম পড়ে আমরা যথেষ্ট ভালো পরীক্ষা দিচ্ছি। এমন ফলাফলের কারণে মহিলা মাদরাসার মেয়েরা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

মহিলাকণ্ঠ : গার্হস্থ্য বিষয়ে কোনো কিছু যোগ করার ব্যাপারে আপনার কী মত?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : এসব বিষয় যোগ করার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। আমরা কিন্তু পড়াই এবং অনেক মাদরাসায় এসব বিষয় শেখানো হয়।

মহিলাকণ্ঠ : না, আমি বলতে চাচ্ছিলাম বোর্ড থেকে এসব বিষয় নির্ধারণ করে দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন কি?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : হ্যাঁ, গার্হস্থ্য শিক্ষাটা তো অবশ্যই দরকার। যেসব মাদরাসায় পড়ানো হয় তারা তো পড়ায়ই। যারা পড়ায় না তাদেরও পড়ানো উচিত। সেই সাথে বেফাকের পক্ষ থেকেও এসব সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া উচিত।

মহিলাকণ্ঠ : প্রসঙ্গ পাল্টাই। লেখালেখির ক্ষেত্রে মাদরাসার মেয়েদের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। যেমন ধরুন বামপন্থীদের ভেতর অনেক লেখিকা আছেন কিন্তু এখানে নেই। এ বিষয়টি কিভাবে দেখবেন?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : আমাদের মাদরাসায় তো দেয়ালিকা, বার্ষিক স্মারক ইত্যাদি প্রকাশিত হয় এবং মাদরাসা কর্তৃপক্ষের উচিত মেয়েদের সাহিত্যচর্চায় উৎসাহিত করা। তবেই আমাদের মধ্যে হতেও লেখিকা বেরিয়ে আসবে।

মহিলাকণ্ঠ : অনলাইনে মাদরাসার মেয়েদের সক্রিয়তা, বিষয়টা কিভাবে দেখবেন?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : এটাও সহিত্যচর্চার একটা মাধ্যম হতে পারে। যদি আমরা এটাকে নিয়ন্ত্রিতভাবে সদ্ব্যবহার করি। যেহেতু এখানে ফেতনার আশংকা আছে সেহেতু সীমারেখা মেনেই এটাকে ব্যবহার করা উচিত।

মহিলাকণ্ঠ : ফেসবুক তো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম। এটা সাহিত্যচর্চার মাধ্যম হবে কী করে?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : ফেসবুক সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম হলেও এটা এখন আর এ বিষয়ে সীমাবদ্ধ নেই। এর মাধ্যমে সমমনা লেখক-সাহিত্যিকদের সাথে মত বিনিময় করতে পারেন। পত্রিকায় লেখা পাঠানো, যোগাযোগ ইত্যাদি সুবিধা হওয়ায় এটাকে সাহিত্যচর্চার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

মহিলাকণ্ঠ : শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : শরিয়তের দৃষ্টিতে মেয়েদের অনলাইনে, বিশেষত ফেসবুকে অতো বেশি সক্রিয় না হওয়াই ভালো। হলেও শরিয়তের সীমারেখায় গণ্ডির ভেতরেই থাকতে হবে। সেটা ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রে একই হুকুম।

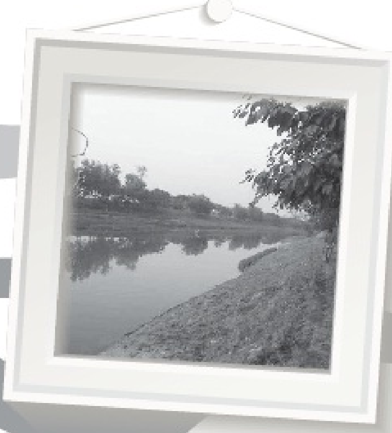
মহিলাকণ্ঠ : মহিলা মাদরাসা সংশ্লিষ্ট সবার জন্য কিছু যদি বলার থাকে...।

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : তাদের বলবো, আপনারা জাতির কর্ণধার। আপনারা এমন কোনো কাজ করবেন না, যাতে আপনাদের দেখে মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। বরং আপনাকে দেখে ইসলামমুখী হয়। আর সাধারণ মানুষকে বলবো, আপনারা আপনাদের মেয়েদের কওমি মহিলা মাদরাসায় দিন, মেয়েদের দীন ও দুনিয়ার কামিয়াবির জন্য।

মহিলাকণ্ঠ : জাজাকিল্লাহু খায়রান, আমাদের সময় দেয়ার জন্য।

সুমাইয়া ইয়াসমিন তামান্না : আপনাদেরকেও শোকরিয়া।









মধুমতীর তীরে কয়েকদিন

ফারুক ফেরদৌস

নিমন্ত্রণটা অপ্রত্যাশিত ছিলো। সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করার চিন্তা ভাবনায়ও শুরুতে তেমন জোর ছিলো না। নিজের গ্রামের বাড়িতে যাওয়া হয় না, তা আরেকজনের বাড়ি। কিন্তু পরীক্ষা একটা একটা করে শেষ হওয়ার সাথে সাথে যাওয়ার ইচ্ছেটাও বাড়ছিলো। কতোদিন ঢাকার বাইরে যাওয়া হয় না! ইট পাথরের ঘেরাটোপের বাইরে দম ফেলি না কতোদিন! শেষবার ঢাকার বাইরে দূরে কোথাও যাওয়া হয়েছিলো প্রায় পাঁচ বছর আগে। দাদার বাড়ি লক্ষ্মীপুরের হোনাইবাড়িতে গিয়েছিলাম দাদার চাল-চুলো ছাড়া ভাঙা ভিটে দেখতে। চাচতো চাচার বিরান চিকার গন্ধময় বাড়িতে একদিনের বেশি থাকার উপায় ছিলো না।

পরীক্ষা শেষ হতে হতে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম, এই নিমন্ত্রণের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলাটা বোকামি হবে। ভ্রমণসঙ্গীদের সবাই বইপোকা লেখিয়ে ছেলে। গ্রামের অফুরন্ত হাওয়ায় সপ্তাখানেক নিঃশ্বাস নেয়ার পাশাপাশি এদের সাথে সময় কাটানোটাও কম ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ছিলো না আমার জন্য। মানুষে মানুষে মিল অনেক আবার অমিল তার চেয়েও বেশি। বিশেষ করে মনের মিল খুঁজে বের করাটা দুরূহ ব্যাপার। ঢাকা থেকে আমার সাথে যাচ্ছিলো হানজালা 'দ্য কবি'। আবুল হাসান সম্পর্কে শামসুর রহমান বলেছিলেন, 'যেন হাওয়ায়, ধুলোয়, গাছের পাতায়, পাখির ডানায়, নদীর জলে, দিনের কোলাহলে, রাত্রির নিস্তব্ধতায় তিনি কবিতা পেয়ে যেতেন।' আমার এই কবি বন্ধুটি মাগুরা গিয়ে পাটক্ষেতেও কবিতা খুঁজে পেয়েছে।

ওখানে আমাদের অপেক্ষায় ছিলো খুলনার ছেলে নাঈম ইসলাম 'দ্য সুরসম্রাট'। ওর গলায় একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলে লোপামুদ্রা আর রেজওয়ানা চৌধুরীর রেকর্ড পানসে লাগবে। আর আমাদের এই পূর্ণদৈর্ঘ্য বেড়ানোর দিলদরিয়া আয়োজক-প্রযোজক আব্দুল্লাহ আমান 'দ্য বইপোকা'। আমার বন্ধুদের প্রায় সবাই প্রচুর বই পড়ে। কিন্তু এই বয়সে এতো বিপুল পরিমাণ বই গিলে ফেলেছে, এরকম আমি আর দেখিনি। আমার বন্ধুমহল ছাড়া পরিচিত মহলেও না।

পরীক্ষা শেষ হবে শনিবার। হানজালার পরীক্ষা শুক্রবারে শেষ। তর সইলো না। মৌখিক পরীক্ষা ছিলো। হুজুরকে বলে কয়ে শনিবারের পরীক্ষা শুক্রবারে দিয়ে জুমার পরপরই আমি আর হানজালা রাস্তায় নামলাম।

যাওয়ার রুট কয়েকটা আছে। গাবতলী হয়ে যাওয়া যায়। মাওয়া ফেরিঘাট হয়ে যাওয়া যায়। মাওয়া হয়ে গেলে ভেঙে ভেঙে যেতে হবে। তবু যাত্রাবাড়ী টু গাবতলী জার্নির কথা ভেবে আমরা মাওয়ার দিকেই রওনা দিলাম।

ঢাকার সীমানা ছাড়িয়ে কিছুদূর এগোতেই সবুজের কাঁচা গন্ধ আর তরতাজা বাতাস আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। বাংলাদেশটাকে দেখার জন্য ঢাকার সীমানা পার হতে হয়। ঢাকার এই অনতিদূরেই চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। কালো পিচঢালা পথটা যেন সবুজের নদীতে একটা ব্রিজ।

বিকেলের আগেই মাওয়া ঘাট থেকে লঞ্চে চড়লাম। পদ্মায় তখন শেষ বিকেলের সোনালি রোদ পড়েছে। ঢেউয়ের সাথে একটা বিস্তৃত সোনালি চাদর যেন দুলছিলো। দুইপাশে অপরূপ গ্রাম বাংলা। কোথাও কোথাও গাঁওকন্যারা কলসি কাঁখে জল তুলছে। বাতাসে দুলছে কাশের বন। তাকিয়ে থেকে দৃষ্টি ফিরে ফিরে আসে।

বাসে চড়ে ফরিদপুর পার হচ্ছিলাম তখন সন্ধ্যা নামছে। গাছের ফাঁকে, বাড়ি-ঘরের খোপে খোপে আঁধার ঘন হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে গ্রামগুলো কালো রেখা হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু' একটি টিমটিম আলো।

জমাট আঁধার দেখতে দেখতে দু'বার বাস বদল করে মাগুরা পৌঁছলাম রাত প্রায় দশটার সময়। পথ তখনো অনেকটা বাকি। আব্দুল্লাহ বারবার ফোন দিচ্ছে। পাড়াগাঁয়ে রাত দশটা মানে নিশুতি রাত। মাগুরা থেকে বাসে চড়ে যেতে হবে মোহাম্মদপুর। সেখান থেকে ভ্যানে হরেকৃষ্ণপুর।

বাসে উঠে বসলাম। বাস আর ছাড়ে না। কন্ডাক্টর টিকেট কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে। সেখান থেকে কৈফিয়ত দিলো, পাঁচশ' ক্যাশ জমা না হলে সে গাড়ি ছাড়তে পারবে না। মনে মনে উজবুকের পাঁচশো রোজগারের জন্য প্রার্থনা করলাম। আল্লা মেঘ দে যাত্রী দে। যাত্রী আর আসে না। চারদিকে নিকষ অন্ধকার। মাগুরা থেকে মোহাম্মদপুরের উদ্দেশে এটাই সেদিনের শেষ বাস।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর গাড়ি ছাড়লো। ভেবেছিলাম মোহাম্মদপুরের দূরত্ব আর কতো হবে। কিন্তু যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। পাশের সিটে বসে হানজালা ঘুমাচ্ছিলো। একবার উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললো, এখানে নদী আইলো কইত্তে! দেখলাম পাশে দ্রুত ধাবমান জ্যোৎস্নালোকিত মাঠ। সেই মাঠ ঘুমকাতর কবির চোখে নদী হয়ে ধরা পড়েছে।

ফোন রিসিভ করা ছেড়ে দিয়েছি। আব্দুল্লাহর দুর্ভোগের কথা ভেবে দুঃখ হচ্ছিলো। মোহাম্মদপুর বাজারে গিয়ে পৌঁছলাম রাত বারোটায়। পুরো বাজারে একটা মাত্র ভ্যান। তাতে ভাড়াও আকাশছোঁয়া। ভ্যানচালক বোধহয় কানে কম শোনে। চিৎকার করে মাথা ধরিয়ে দিলো। ভ্যান বাজার ছাড়ার পর আশেপাশের কুকুর সম্প্রদায় মহা বিরক্তির সাথে এই নিশিরাতের আগন্তুকদের অভ্যর্থনা জানানো শুরু করলো।

ঝাঁকুনি খেতে খেতে হরেকৃষ্ণপুর পৌঁছলাম। আব্দুল্লাহ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলো। চারদিকে এতো অন্ধকার যে কাউকে দেখাই যায় না। আব্দুল্লাহ প্রথমেই আমাদেরকে একচোট ঝাড়লো, কেন গাবতলী রুট ছেড়ে এদিক দিয়ে এলাম।

রাত তখন পৌনে একটা হবে। আব্দুল্লাহদের বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। চারদিকে সুনসান নীরবতা। একটা হারিকেন টিমটিম জ্বলছে। রাতের প্রথম প্রহর সার্ভিস দিয়ে সে বড়ই ক্লান্ত। হাত মুখ ধুইয়ে আব্দুল্লাহ আমাদের নিয়ে গেলো বাড়ির পেছনের বাঁশবাগানে। বাঁশবাগানের মাথায় রুপোর থালার মতো মস্ত এক চাঁদ উঠেছে। চারদিকে থৈ থৈ জোছনার সেই ভুবনে দাঁড়িয়ে সারাদিনের ক্লান্তি জল হয়ে গেলো। মাটিতে আঁধারের কালো জমিনে চিরল বাঁশপাতার নকশার অপূর্ব বর্ণনাতীত সৌন্দর্যের সামনে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ সেখানে কাটিয়ে হারিকেনের আলোয় বেড়ালের মতো নিঃশব্দে হেঁটে গেলাম হেঁসেলে। দস্তরখানজুড়ে পদ আর পদ। গুনে দেখিনি। অন্তত দশ পদ তো ছিলোই। উড়ে এসে জুড়ে বসা অতিথিদের জন্য এতো আয়োজন! হেঁসেলবাসীদের ভোগান্তির কথা ভেবে লজ্জা পাচ্ছিলাম। আব্দুল্লাহদের আলেম পরিবার কঠিন পর্দা মেনে চলে। বেড়ানোর পুরো সময়টায় অন্তঃপুরের কাউকে এক নজরের জন্যও আমরা দেখিনি। কিন্তু পর্দার পেছনে থেকেই আমাদের জন্য আতিথেয়তায় যে আন্তরিকতা তারা দেখিয়েছেন তা ভোলার নয়।

একদিনের কথা খুব মনে পড়ে। আব্দুল্লাহ আর হানজালা যেন কোথায় গিয়েছে। অনেকক্ষণ হয়েছে ফিরছে না। আমি একলা বাঁশবাগানে বসে একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছি। দেখলাম আব্দুল্লাহর তিন বছর বয়সী ভাগ্নে- যে নতুন মামাদেরকে সাধারণত দূর থেকে দেখতেই বেশি পছন্দ করে, একটা ট্রে নিয়ে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে ট্রে নামিয়ে রেখেই ও ছুটে চলে গেলো। তাকিয়ে দেখি সেখানে শুধু লবণ। ভাবছিলাম শুধু লবণ খাওয়ার কোনো রীতি এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে কিনা কে জানে! কিন্তু একটু পরেই দেখলাম বাচ্চাটা আরো নানান জিনিসপত্র একটা একটা করে এনে রাখছে। বুঝলাম পুরো ট্রে একসাথে আনতে পারবে না দেখে এভাবে পাঠানো হচ্ছে। পর্দার পেছনের মানুষগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে গেলো। বাড়ি থেকে এত দূরে বসে আছি, কিন্তু জুড়ে বসা মেহমানের কথা তাঁরা ঠিকই মনে রেখেছেন।

আমরা ওঁদের ভুগিয়েছি কম নয়। আমাদের এক বন্ধু নাঈম গিয়েই বিছানায় পড়লো। শুয়ে নড়তে চড়তে পারে না। এক রাতে ও বমি করেছে বারো কি তেরোবার। লেও ঠ্যালা! আব্দুল্লাহর এক বোনও ছেলে মেয়ে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন সেই সময়। আমরা সারাদিন বাড়ির পেছনের রাজ্যপাট দখল করে বসে আছি। আমাদের কারণে ওঁরা গ্রামে বেড়াতে এসেও সারাদিন ঘরে বন্দি। এতো অত্যাচারের পরও কচুশাক আর ওল খাইয়ে আমাদের না তাড়িয়ে প্রত্যেক বেলায় পাঁচ ছয় পদের ব্যঞ্জন এই

মহীয়সীরা আমাদের সামনে পরিবেশন করে গেছেন।

পরদিন ফজরের নামাজে গিয়ে মসজিদে দেখা হলো আব্দুল্লাহর বাবা সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ মাওলানা আমানুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে। তাঁর কথা আগেই শুনেছিলাম। আশেপাশের দশ গ্রামে অসংখ্য মসজিদ-মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা তিনি। আমাদের বলেছিলেন, আমরা মসজিদে ইমামতি করি, মাদ্রাসায় পড়াই শুধু আল্লাহর জন্য কিন্তু না। ওখান থেকে বেতন নিয়ে আমরা সংসার চালাই। শুধু আল্লাহর জন্য দীনের কিছু কাজ করা দরকার। তিনি স্কুলে পড়তেন। অত্যন্ত সুদর্শন মেধাবী তরুণ হিসেবে আশেপাশের কয়েক গ্রামে তার নাম ছিলো। ক্লাস নাইন শেষ করে তাবলিগে বের হয়েছিলেন। আর স্কুলে ফেরেননি। শামসুল হক ফরিদপুরীসহ বহু পির-আউলিয়ার সান্নিধ্যধন্য এই আলেম যশোর পলিটেকনিক কলেজ মসজিদে ইমামতি করতেন। প্রায় পঁচিশ বছর ইমামতি করার পর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তাবলিগের সালে বের হয়ে গিয়েছিলেন। এখন বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। স্মৃতিতে বয়সের ছাপ পড়েছে। কিন্তু ঘুরে ফিরে দীনের কথা নামাজের কথা দাওয়াতের কথাই বারবার বলেন।

ঢাকা ফেরার সময় বাসে আমার পাশের লোকটি হরেকৃষ্ণপুর গ্রাম চেনে না। কিন্তু মাওলানা আমানুল্লাহর নাম বলতেই চিনে ফেলেছিলো। নিজের নাম স্মরণীয় করে রাখার জন্য এই পুণ্যবান আলোর দিশারীরা পাথরের নেমপ্লেট খোদাই করেন না। তবু তাদের কীর্তিগাথা মানুষের মুখে মুখে ঠিকই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিশাল বাংলার গ্রামে গ্রামে মাওলানা আমানুল্লাহরাই দীনের মশাল জ্বালিয়ে রাখেন। এঁদের নাম লেখা থাকে শুধু আল্লাহর খাতায় সোনার হরফে। এঁদের দরবারে মোম জ্বলে না। লালসালু চড়ে না। মানুষ ব্যস্ত থাকে ভণ্ড শাহপুরী পির কুতুব আর ধান্দাবাজ আল্লামাদের নিয়ে। এই সোনার মানুষের সাক্ষাৎ এই সফরে আমার অন্যতম প্রাপ্তি।



ফজর থেকে ফিরে বিছানাপত্র নিয়ে আমরা ঘুমাতে গেলাম বাঁশবাগানে। ঘুম কি আর আসে! কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়লাম। এরমধ্যে আব্দুল্লাহ জাম পাড়তে গাছে চড়েছে। ওকে তরতর করে আকাশছোঁয়া জামগাছে উঠে যেতে দেখে হিংসে হলো। এই গাছটার সবচে' নিচের ডাল পর্যন্ত ওঠার মুরোদও আমার নেই। জামতলা টসটসে জাম পড়ে ভরে আছে। কুড়িয়ে খাওয়ার কেউ নেই। একেকটা জামের শুধু আকার দেখলেই মন ভরে যায়। জাম আমার খুব প্রিয় ফল নয়। কিন্তু হরেকৃষ্ণপুরের জামের স্বাদ মুখে লেগে থাকবে অনেকদিন।

বিছানায় পড়া নাঈমের মূল সমস্যাটা পেটে। নাড়ির টিউমারে অপারেশন হয়েছিলো সেখানে ইনফেকশন দেখা দিয়েছে। ভারি কোনো খাবার খাওয়া নিষেধ। কিন্তু সামনে বাটি ভর্তি জাম দেখে ও ওর ডাক্তার বাবার কাছে ফোন করলো জাম খাওয়ার অনুমতি আদায় করতে। ওর বাবা হয়তো বলেছিলো জাম খাওয়া যাবে সমস্যা নাই। কিন্তু ফোন রেখে নাঈম বললো, বাবা ওকে বেশি বেশি জাম খেতে বলেছে!

আব্দুল্লাহদের গাছের জামের মোহনীয় রূপ দেখে মরণাপন্ন রোগীও প্রেসক্রিপশন জাল করে! সেদিনটা বাঁশবাগানে রোদের খেলা দেখে আর পাড়াগাঁয়ের পথে বেড়িয়ে কেটে গেলো। বিকেলের দিকে গেলাম মধুমতীর বাওর দেখতে। বাওরে পানি নেই। সব শুকিয়ে খটখট করছে। শুকনো বাওরে হেঁটে বিকেল পার করে সন্ধ্যা লাগিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

বাঁশবাগানে আরেকটি জ্যোৎস্নালোকিত রাত নামলো। আব্দুল্লাহদের বাড়িতে যতদিন ছিলাম, বিছানাপত্র নিয়ে বাঁশবাগানেই রাত কাটিয়েছি। সেই রাতগুলোর এখন কেমন অলীক স্বপ্নদৃশ্যের মতো মনে হয়। চিরল সবুজ বাঁশপাতার শতছিদ্র সামিয়ানা চুইয়ে জোছনা গলে গলে পড়ছে আমাদের বিছানার পাশে। বাতাসে বাঁশপাতা কাঁপছে জোছনাও কাঁপছে। উপরে আকাশ রবিবাবুর চন্দনে মাখামাখি। হরেকৃষ্ণপুরের কথা মনে হলেই এই মায়াবী আলোয় ভেসে যাওয়া রাতগুলোর কথা প্রথম মনে পড়ে।

পরদিন মাগরিব পড়ে পাটক্ষেতের আইল ধরে চললাম রাতের মধুমতী দেখতে। দুইপাশে মাথার উপর পর্যন্ত পাটগাছ। আইল এতোই সরু যে মাঝে মাঝে ক্ষেতের মধ্যখান বলে ভ্রম হয়। দুই হাতে পাটগাছ সরিয়ে অতিকষ্টে পথ চলছিলাম। দুইপাশে কিছু দেখার উপায় নেই। জমাট ঘন অন্ধকার। উপরে তারাখচিত আকাশটা শুধু চোখে পড়ে। তখনো চাঁদ ওঠেনি। অনেকটুকু গিয়ে একটা ছোট মাঠের মতো।

অসুস্থ নাঈমের হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিলো। ও সেখানেই বসে পড়লো। আমাদের সাথে

আব্দুল্লাহ আমানের চাচাতো ভাই ছিলো। সেও সেখানে বসলো। আমি হানজালা আর আব্দুল্লাহ হাঁটছিলাম নদীর দিকে। এই রাস্তায় আমি একটু পেছনে পড়ে গেলাম। মাঠ পেরিয়ে আবার পাটক্ষেত শুরু হয়েছে। পাটক্ষেতে ঢুকে আমি ওদেরকে পুরোপুরি হারিয়ে ফেললাম। ভাবলাম পেছনে ফিরে যাই। কিন্তু পেছনে ফিরে পাটক্ষেত থেকে বের হয়ে মাঠের দিকে তাকিয়েই আমার স্মৃতি গোলমেলে হয়ে গেলো। এই মাঠ পেরিয়েই কি আমি এসেছি! তারার ধুসর আলোয় মাঠটাকে দেখে মন কেমন ভয় ভয় করে উঠলো। আকাশ যেন উপুড় হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মাঠটার উপর। চারদিকে মাটি আকাশ আর মাথা সমান কালো কালো পাটগাছ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। পকেট থেকে মোবাইল বের করে ওদের নাম্বারে ফোন দিতে গিয়ে যখন দেখলাম মোবাইলের নেটওয়ার্ক কাজ করছে না, ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। মোবাইলের ফ্লাশলাইট জ্বালিয়ে চারদিক দেখতে চেষ্টা করলাম। সেই বিপুল অন্ধকারে মোবাইলের ফ্লাশ কি কাজে লাগে!

দিশেহারা হয়ে এলোমেলো পথে হাঁটছিলাম। বুঝতে পারছিলাম এভাবে আরো হারিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমি ঠিক দাঁড়িয়েও থাকতে পারছিলাম না। চারদিকে না আছে পথের চিহ্ন না কোনো জনপ্রাণীর। শুধু নিশাচর পোকার ডাক আর বাতাসের শব্দ। বাতাস যেন আমাকে উড়িয়ে নিচ্ছিলো। অনেকক্ষণ হাঁটার পর দূরে টিমটিম একটা আলো চোখে পড়লো। গতি বাড়িয়ে সেইদিকে গেলাম। সুন্দর সাজানো গোছানো ছবির মতো একটি বাড়ি। বারান্দায় কুপিবাতি জ্বালিয়ে দু'টি ছেলে লেখাপড়া করছে। পাশে তাদের মা মাটিতে শুয়ে আছে। আমাকে দেখে ভদ্রমহিলা ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। ভীত গলায় বললেন, কী ব্যাপার? আমি আমার অবস্থাটা ব্যাখ্যা করলাম। ভদ্রমহিলা সন্দিহান চোখে তাকিয়ে রইলেন। বড় ছেলেটা হাত পা নেড়ে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো এদিক দিয়ে একটু ওদিক হয়ে আরেকটু এদিকে গেলেই খুব সহজ রাস্তা।

বাড়ি থেকে বের হয়ে কিছুদূর গিয়ে বুঝতে পারলাম, আজন্ম শহুরে আমি কিছুতেই এই রাস্তায় পথ খুঁজে যেতে পারবো না। আবার ফিরে চললাম বাড়িটায়। সেখানে তাও দু'একজন মানুষ আছে। আমাকে দেখেই ভদ্রমহিলা চিৎকার করে বললেন, আমি কিছুতেই বাচ্চাদের কাউকে আপনার সাথে দেবো না। তার ভয়টা যৌক্তিক বুঝতে পারছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বাসায় পুরুষ মানুষ কেউ নেই? প্রশ্ন শুনে মহিলা আরো ভয় পেয়ে গেলেন। গলা নিচু করে মিথ্যে বললো, ভেতরে শুয়ে আছে। অসুস্থ। আসলে তাদের ঘরের পুরুষ লোকটি বাইরে থেকে সবে বাড়ি ফিরছিলো। আলো দেখে গেট পেরোনোর আগেই আমি গিয়ে ভদ্রলোককে ধরলাম। তাকে সাথে নিয়ে বেশ কিছুদূর হাঁটার পর আগের রাস্তা খুঁজে পেলাম।





আমার বন্ধুরা সেখানে মোবাইলের ফ্লাশ জ্বালিয়ে আমার মতোই চারদিক দেখার ব্যর্থ চেষ্টা করছে আর আমার নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। খুব রাগ হচ্ছিলো আব্দুল্লাহ আর হানজালার উপর। গিয়ে শুনলাম ওরা ভেবেছিলো আমি এখানে নাঈমের সাথেই বসে থাকবো। পথ খোঁজার টেনশনে আমার সময়ের হিসেব ছিলো না। ততক্ষণে প্রায় দু'টি ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। আবার পাটক্ষেতের আইল ধরে চললাম বাড়ির দিকে। রাতের মধুমতী আমার দেখা হলো না। এই দুঃখটা মনে রয়ে গেছে। এরপর আরো কয়েকদিন তো ছিলাম আব্দুল্লাহদের বাড়িতে। কিন্তু মায়াময়ী রাতে একবার মধুমতীর তীরে গিয়ে দাঁড়ানোর আর সুযোগ হলো না।

মধুমতীর নদী দেখেছিলাম পরদিন দিনের বেলা আব্দুল্লাহদের নানাবাড়ি

যাওয়ার সময়। পল্লীকবি জসীম উদ্দিনের মায়াবতী রূপবতী নদী। মধুমতীর তীরে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করেছিলাম ছোটনদীকে কেন জননী বলা হয়। পদ্মা মেঘনার প্রমত্তা রূপ, বিস্তীর্ণ বিপুল জলরাশি এর নেই। দুইপাশের গ্রাম গুলোকে মায়ের মতো স্নেহ-মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে ছোটনদী মধুমতী এঁকে বেঁকে চলে গেছে। আব্দুল্লাহর মামা একটা দিন আমাদের আন্তরিক আতিথেয়তায় ডুবিয়ে রাখলেন। বাড়ি আর মাঠের কাজে অসম্ভব ব্যস্ত এই মানুষটি ঘন্টার পর ঘণ্টা গল্প করেছেন আমাদের সাথে বসে বসে। মামী-আপুরা একদিনে দু'বার নুডলস রেঁধে

নানাবাড়ি থেকে রওনা হয়ে মধুমতী পার হতে হতে দুপুর পেরিয়ে গেলো। নদীর তীরে ব্যাগ রেখে আমরা নদীতে নামলাম। বেশিদূর যাওয়ার সাহস হলো না আমার। সাঁতার জানি না। নদীতে নামলামও কতো বছর পরে। কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে নদীর দুই ধারে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখছিলাম। 'কী সৈন্দর্য্য গো কী সৈন্দর্য্য!'

অনেকক্ষণ ডোবাডুবি করে নদীর তীরে কাপড় শুকিয়ে হেঁটে আব্দুল্লাহদের বাড়ি ফিরলাম আসরের পর। এবার ঢাকার দিকে রাস্তা মাপতে হবে। জুড়ে বসা উপদ্রব হয়ে আর কতোদিন থাকা যায়!



খাইয়েছেন। খাইয়েছেন আরো অনেক কিছুই। নুডলস প্রিয় খাবার দেখে নুডলসের কথাটা বিশেষভাবে মনে আছে। পরে অবশ্য জেনেছিলাম নুডলসের কৃতিত্বটা বন্ধুবর আব্দুল্লাহ আমানের। ওদের বাড়িতে একবার বলেছিলাম নুডলস আমার ফেভারিট। আব্দুল্লাহ চার দিনে পাঁচবার আমাকে নুডলস খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছে। কথাটা মনে রেখেছি। মনে রাখা ছাড়া আর কীইবা করার আছে! এগুলোর কোনো প্রতিদান হয় না। প্রতিদানহীন তাই মনে রাখতে হয়।

পরদিন অসুস্থ নাঈমকে ওদিক থেকে খুলনার বাসে তুলে দিয়ে আব্দুল্লাহর

কোন দিক দিয়ে যে পাঁচদিন কেটে গেছে টেরই পাইনি। বাঁশবন শনশন উতাল হাওয়া, দিগন্তছোঁয়া তরঙ্গায়িত সবুজ, ছায়ায় ছায়ায় সোনালি রোদের নকশা, জোছনায় ভেজা মায়াময় রাত আর অসাধারণ কিছু মানুষের দুনিয়ায় সময় যেন ঝিম ধরে থেমে ছিলো। মনে হচ্ছিলো কত যুগ যুগ ধরে এইখানে আছি। এই বাঁশবাগান আর সোনালি রোদ কতোদিনের চেনা- কতো আপন। সেই দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের বাইরে যেন কোনো দুনিয়া নাই। সময় নাই। কর্ম নাই। ইট পাথর আর কৃষ্ণ ধোঁয়ার কোনো শহর নাই। মায়াবী স্বপ্নের বাইরে রূঢ় কঠিন কোনো বাস্তব নাই।

কিন্তু এই ঘোরকে আর কাহাতক প্রশ্রয় দেয়া যায়! অনেক তো হলো। পরদিন সকালে নাস্তার সময় আব্দুল্লাহর বাবা পাশে দাঁড়িয়ে পাখা দিয়ে বাতাস করছিলেন। উসখুস করতে করতে বারবার তাকাচ্ছিলাম তাঁর দিকে। আমাদের অস্বস্তি দেখে এই পুণ্যবান মানুষটি বললেন, আমি সওয়াব কামাচ্ছি তাতে তোমাদের এত সমস্যা কী! এই কথার পর আর কী বলার থাকে। পর্দার এপাশ থেকে আব্দুল্লাহর মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। পৃথিবীর সব মায়েদের কথা শুনতে আসলে একই রকম। সন্তানের জন্য প্রাণ উজাড় করে দিয়েও তাঁরা ভাবেন কিছুই করা হলো না।

ঢাকা থেকে গিয়েছিলাম হানজালার পাশের সিটে বসে গল্প করতে করতে। ফিরলাম দুইজন দুই জানালার পাশে বাইরের দিকে মুখ করে। লঞ্চে পদ্মা পার হয়ে ঘাটে ওঠার সময় পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়ালাম। পেছন থেকে হানজালা বললো, 'পইড়া গেলে খবর দিও।' হেসে বললাম, 'ক্যা? ছবি তুইলা ফেসবুকে আপলোড দিবা?'

আসার আগে ফেসবুকে একটা ছবি আপলোড দেয়া নিয়ে বিরাট কাইজা করেছি ওর সাথে। একটু বেশিই করে ফেলেছি। ছবিটা আসলে তেমন কিছু না। কয়েকদিন ধরে অনবরত ভাব নিচ্ছিলো বলে রাগ বেশি উঠে গেছিলো। বাসে আমার পাশে বসেছিলো হাসিখুশি চেহারার তরুণ দুই ভাই। একবার গাড়ি থেমে ছাড়ার সময় আমার কাইজাওয়ালা বন্ধুটি উঠেছে কিনা দেখছিলাম দেখে একজন জিজ্ঞেস করলো 'উনি কি আপনের বন্ধু?' বললাম 'হুম। কাইজা করছি দেইখা দুইজন দূরে দূরে সিট নিছি।' শুনে ছেলেগুলির হাসি আর থামে না। এত হাসির কি হলো কে জানে!

গাবতলী থেকে যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত চার ঘন্টার আট নম্বর বাসের জার্নি ঝাঁকুনি দিয়ে মনে করিয়ে দিলো ঢাকা পৌঁছে গেছি। ঘোরলাগা চোখ কচলিয়ে রুক্ষ কঠিন বাস্তবের দিকে তাকালাম। স্বপ্নাবিষ্ট দারুণ সময়টাকে পাঠিয়ে দিলাম স্মৃতির সোনার খাঁচায়। সোনার পক্ষী হয়ে ডানা ঝাপটাও দিনের পর দিন।



হে আমার মেয়ে!

শায়খ আলি তানতাভি রহমাতুল্লাহি আলায়হি
অনুবাদ : আমিন আশরাফ

আমার মেয়ে!
আমি চল্লিশের জগৎ পার হয়ে পঞ্চাশের পথে পা রেখেছি। যৌবনকে বিদায় দিতে যাচ্ছি, সে-ও আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে চায়। নতুন কোনো স্বপ্ন এবং উচ্চাকাঙ্খা আর নেই।
আমি অনেক দেশ ও শহর ভ্রমণ করেছি, বহু জাতির সাহচর্য লাভ করেছি এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অনেক ধারণা অর্জন করেছি। আজ আমার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শোনো!
কথাগুলো সঠিক ও সুস্পষ্ট। এগুলো আমার বয়স ও অভিজ্ঞতার আলোকেই তোমাকে বলছি। আমি ছাড়া আর কেউ হয়তো তোমাকে এগুলো বলবে না।
আমি অনেক লিখেছি, মিম্বারে ও সমাবেশে দাঁড়িয়ে অনেক ভাষণ দিয়েছি, অনেক নসিহত পেশ করেছি। উত্তম চরিত্র অর্জনের আহবান জানিয়েছি, অশ্লীলতা বর্জন ও সকল প্রকার অন্যায় কাজ বর্জনের ডাক দিয়েছি। নারীদের ঘরে ফিরতে ও কোরআনের সুপ্রসিদ্ধ বিধান পর্দার আবরণে আবৃত হওয়ার আহবান জানিয়েছি, তাদের সৌন্দর্য্যের স্থানগুলো ঢেকে রাখতে বলেছি। লিখতে লিখতে কলম এখন দুর্বল হতে চলছে, কথা বলার সময় মুখে তা আটকে যাচ্ছে।
এতো কিছু করার পরও আমি মনে করি না যে, আমরা কোনো অশ্লীল কাজ সমাজ থেকে দূর করতে পেরেছি। বেহায়াপনা দিনদিন বেড়েই চলছে, পাপাচারিতা দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে এবং অশ্লীলতা দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। আমার মনে হয় কোনো ইসলামি দেশই এর আক্রমণ থেকে মুক্ত নয়। মিসর, সিরিয়া, আরব তথা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের সীমা পার হয়ে পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশসহ সমগ্র এশিয়ায় এর আক্রমণ বেড়েই চলেছে। মহিলারা বের হচ্ছে পর্দাহীন হয়ে, সৌন্দর্যের স্থানগুলো প্রকাশ করে, মুখমণ্ডল, বক্ষদেশ এবং কেশ উন্মুক্ত করে। আমার ধারণা, নসিহত করে আমরা সফল হইনি।

হে আমার কন্যা!
তুমি কি জানো কেন আমরা সফল হইনি? সম্ভবত আমরা এখনও গ্রহণযোগ্য পন্থায় নসিহত করতে পারিনি এবং সংশোধনের দরজায় পৌঁছাতে পারিনি।
মেয়ে আমার! আমরা তোমার দীনি বোনদেরকে আল্লাহর ভয় দেখিয়েছি, কিন্তু কাজ হয়নি। অতঃপর অবৈধ সম্পর্ক ও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে সতর্ক করেছি, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। এ বিষয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে, বহু বক্তৃতা দেয়া হয়েছে, তা-ও ব্যর্থ হয়েছে। এখন আমি ক্লান্ত শরীরে পরাজিত সৈনিকের মতো ময়দান ছেড়ে বিদায় নিতে চাচ্ছি। আমি বিদায় নিয়ে তোমার দীনি বোনদের ইজ্জত-সম্ভ্রম ও সতীত্ব রক্ষার দায়িত্ব তোমার হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি, তোমার বিপথগামী বোনদেরকে উদ্ধার ও সংশোধনের বিষয়টি তোমার উপরই রেখে দিয়ে তোমার সফলতার দিকে চেয়ে আছি।

আমার আত্মজা!
তুমি জেনে রেখো, তোমার হেফাজত তোমার হাতেই। এ কথা সঠিক যে, পাপের পথে অগ্রসর হওয়াতে পুরুষকেই প্রথম দায়ী করা যায়। নারী কখনোই প্রথমে এ পথে অগ্রসর হয় না। তবে তাদের সম্মতি ব্যতীত কখনোই পুরুষ অগ্রসর হতে পারে না, নরী নরম না হলে পুরুষ শক্ত হয় না। নারী দরজা খুলে দেয় আর পুরুষ তাতে প্রবেশ করে।

আমার বেটি!
তুমি যদি চোরের জন্য ঘরের দরজা খুলে দাও আর চোর চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার পর তুমি চিৎকার করে বলো– হে লোকসকল! আমাকে সাহায্য করো... আমাকে সাহায্য করো... তাহলে তোমার চেঁচামেচি করা কি ঠিক হবে? তোমার কান্নাকাটিতে কি লাভ হবে? তোমার সাহায্যের জন্য কেউ কি এগিয়ে আসবে?

আমার কন্যা!
তুমি যদি জানতে পারো, পুরুষ হচ্ছে নেকড়ে আর তুমি হচ্ছো ভেড়া, তাহলে কিন্তু তুমি নেকড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ভেড়ার ন্যায় পলায়ন করবে। তুমি যদি জানতে পারো, সকল পুরুষই চোর তাহলে কৃপণের মতো তুমি তোমার সকল মূল্যবান সম্পদ পুরুষের কবল থেকে হেফাজত করার জন্য সিন্দুকে লুকিয়ে রাখতে। মনে রেখো, নেকড়ে কিন্তু ভেড়ার গোশত ছাড়া অন্য কিছু চায় না। আর পুরুষ তোমার কাছে থেকে যা ছিনিয়ে নিতে চায় তা কিন্তু ভেড়ার গোশতের চেয়েও অনেক মূল্যবান। তা যদি তোমার কাছে থেকে চলে যায়, তাহলে জেনে রাখবে তা হারিয়ে তোমার বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। সে তোমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটি নষ্ট করতে চায়, তোমার সম্মানের বিষয়টি ছিনিয়ে নিতে চায় এবং তোমার অমূল্য রত্নটি অপহরণ করতে চায়।
সেটি হচ্ছে তোমার সতীত্ব ও পবিত্রতা, যাতে রয়েছে তোমার সম্মান, যা নিয়ে তুমি গর্বিত হয়ে বেঁচে থাকতে চাও। আল্লাহর শপথ! পুরুষ তোমার এটিই নিয়ে নিতে চায়। এটি ছাড়া অন্য কথা কেউ বললে তুমি তা বিশ্বাস করো না।

আমার শাহজাদি!
পুরুষ যখন কোনো যুবতীর দিকে দৃষ্টি দেয় তখন সে তাকে বস্ত্রহীন অবস্থায় কল্পনা করে। আল্লাহর শপথ! হে আমার মেয়ে! এ ছাড়া সে অন্য কিছু চিন্তা করে না। তোমাকে যদি কেউ বলে, সে তোমার উত্তম চরিত্রে মুগ্ধ, তোমার আচার-ব্যবহারে আকৃষ্ট এবং সে কেবল তোমার সঙ্গে সাধারণ একজন বন্ধুর মতোই আচরণ করে এবং সে হিসেবেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায় তাহলে তুমি তা বিশ্বাস করো না।

আমার প্রাণাধিক!
যুবকেরা তোমাদের আড়ালে যেসব কথা বলে তা যদি তোমরা শুনতে, তাহলে এক ভীষণ ভীতিকর বিষয় জানতে পারতে। কোনো যুবক তোমার সঙ্গে যে কথাই বলুক, যতোই হাসুক, যতো নরমকণ্ঠেই কথা বলুক ও যতো কোমল শব্দই ব্যবহার করুক, সেটি তার আসল চেহারা নয়; বরং সেটি তার অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ভূমিকা ও ফাঁদ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুকৌশলে সে যতোই তোমার সামনে তা গোপন রাখুক। আল্লাহর শপথ! এ ছাড়া তার উদ্দেশ্য অন্য কিছু নয়।

আমার মেয়ে!
সে যদি তোমাকে তার ষড়যন্ত্রের জালে আটকাতে পারে তাহলে কী হবে? কী হবে তোমার অবস্থা? তোমার কি তা জানা আছে? একটু চিন্তা করো।
কোনো নারী যদি এমন কোনো দুষ্ট পুরুষের কবলে পড়ে যায়, তখন সে হয়তো সেই পুরুষের সঙ্গে মিলে কয়েক মিনিট কল্পিত স্বাদ উপভোগ করবে। তারপর কী হবে? তুমি কি তা জানো? পরক্ষণেই সে তাকে ভুলে যাবে। সে তাকে দ্বিতীয়বার পাওয়ার আশা পোষণ করবে। হয়তো কয়েকবারের জন্য তাকে পেলে পেতেও পারে; তবে স্বামী হিসেবে তার সঙ্গে চিরদিন বসবাস করার জন্য এবং স্বীয় যৌবন পার করার জন্য নয়। সে অচিরেই তাকে ভুলে যাবে। এটিই সত্য। কিন্তু সেই মেয়েটি চিরদিন সেই স্বল্প সময় উপভোগের জ্বালা ভোগ করতে থাকবে, যা কখনো শেষ হবে না।
এ-ও হতে পারে, সে তার গর্ভে এমন কলঙ্ক রেখে যাবে, যা থেকে কখনোই সে পরিত্রান পাবে না। চিরদিন তার কপালে হতাশার ছাপ থাকবে, চোহারায় দুশ্চিন্তার ছায়া পড়বে। সে তাকে ছেড়ে দিয়ে আরেকটি শিকার খুঁজতে থাকবে এবং নতুন নতুন প্রেমিকার সতীত্ব ও সম্ভ্রম হরণের অনুসন্ধানে বের হবে।

হে আমার মেয়ে!
এভাবে একটি যুবক অগণিত নারীকে নষ্ট করলেও আমাদের জালেম সমাজ তাকে একদিন ক্ষমা করে দিবে। সমাজ বলবে– একটি যুবক পথহারা ছিলো, সে সুপথে ফিরে এসেছে। এই অজুহাতে সে হয়তো সমাজের কাছে গৃহীত হবে এবং সকলেই তাকে গ্রহণ করে নেবে। আর তুমি অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়ে চিরদিন পড়ে থাকবে। তোমার জালেম সমাজ কখনোই তোমাকে ক্ষমা করবে না।

হে আমার মেয়ে!
তোমার সম্মান তোমার হাতেই রেখে দিলাম এবং তোমার ইজ্জত-আব্রু ও

মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব তোমার উপরই ছেড়ে দিলাম। সুতরাং তোমার বোনদেরকে উপদেশ দাও, বিপথগামীদেরকে সংশোধন করো এবং সুপথে ফিরিয়ে আনো।

আমার কন্যা!
তুমি তাদেরকে বলো– হে আমার বোন! পথ চলার সময় কোনো পুরুষ যদি তোমার দিকে তাকিয়ে দেখে তবে তুমি তার থেকে বিমুখ হয়ে যাও এবং তোমার চেহারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে ফেলো। এরপরও যদি তার কাছ থেকে সন্দেহজনক কোনো আচরণ অনুভব করো কিংবা সে তোমার গায়ে হাত দিতে চায় অথবা কথার মাধ্যমে তোমাকে বিরক্ত করতে উদ্যত হয় তাহলে তোমার পা থেকে জুতা খুলে তার মাথায় আঘাত করো। তুমি যদি এ কাজটি করতে পারো তাহলে দেখবে পথের সকলেই তোমার পক্ষ নিবে, তোমাকেই সাহায্য করবে। সে আর কখনো তোমার মতো অন্য কোনো নারীর উপর অসৎ দৃষ্টি দিবে না। সে যদি সত্যিই তোমাকে পছন্দ করে থাকে তাহলে তোমার এই আচরণে তার হুঁশ ফিরবে, তওবা করবে এবং তোমার সাথে হালাল সম্পর্ক গড়ার জন্যে বৈধ পন্থা অবলম্বনের দিকে অগ্রসর হবে।

আমার হৃদয়ের স্পন্দন!
শোনো! নারী যতো উচ্চমর্যাদাই অর্জন করুক, শিক্ষা ও জ্ঞানে যতোই অগ্রগতি লাভ করুক এবং ধন-সম্পদ ও সুখ্যাতি যতোই আয়ত্ব করুক, এতে তাদের প্রকৃত প্রত্যাশা পূর্ণ হবে না, তাদের মান-মর্যাদা, প্রসিদ্ধি, সুখ্যাতি, ধন-সম্পদ তাদের মনকে শান্ত করবে না। বিবাহ ও স্বামীর সান্নিধ্যই কেবল দিতে পারে তাদেরকে অনাবিল শান্তি, এর মাধ্যমেই পূরণ হতে পারে তাদের প্রত্যাশা।
নারীগণ তখনই প্রকৃত শান্তি খুঁজে পায় যখন সে একজন সৎ ও আদর্শ স্ত্রী হতে পারে, সম্মানিত একজন মা হতে পারে এবং একটি বাড়ির পরিচালক হতে পারে। এ ক্ষেত্রে একজন সাধারণ নারী থেকে শুরু করে রাণী, রাজকন্যা, অভিনেত্রী, বিশ্বসুন্দরীর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সকলের ক্ষেত্রেই একই কথা।
এ ক্ষেত্রে আমি নাম উল্লেখ না করে দু'জন নারীর উদাহরণ দিতে চাই। আমি তাদেরকে চিনি ও জানি। তারা উচ্চশিক্ষিতা, ধনবতী ও সুসাহিত্যিক। স্বামীহারা হয়ে তারা প্রায় পাগল অবস্থায় বেঁচে আছেন। কয়েকদিন আগেও তাদের জীবন ছিলো স্বাভাবিক, মুখে ছিলো হাসি আর আনন্দে ছিলো ভরপুর তাদের জীবন। তাদের সবই আছে। হারিয়েছে শুধু স্বামী।
বিবাহ হচ্ছে প্রতিটি নারীর সর্বোচ্চ কামনা। এটিই তাদের মনের বাসনা। এটি দিয়েই তাদের মহান প্রভু তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সে যদি পার্লামেন্টের সদস্যও হয়ে যায় কিংবা কোনো রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টও হয়ে যায় তথাপি তাদের মনের প্রকৃত বাসনা পূর্ণ হবে না, যতোক্ষন না বউ হয়ে স্বামীর ঘরে প্রবেশ করতে পারবে।

আমার ঔরস!
জেনে রেখো! একবার যদি কোনো মেয়ের জীবনে কলঙ্ক নেমে আসে এবং তার সমাজ যদি তা জেনে ফেলে তবে কেউ তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে না। এমন কি যেই পুরুষ তাকে নষ্ট করেছে সেও তাকে বিয়ে করে নিজের সংসার গড়তে রাজি হবে না। অথচ সে বিয়ের মিথ্যা ওয়াদা করে তার সতীত্ব ও সম্ভ্রম নষ্ট করেছে এবং মনের চাহিদা পূরণ করে কেটে পড়েছে। বরং সে যখন বিয়ের মাধ্যমে কোন নারীকে ঘরে উঠাতে চাইবে তখন তাকে বাদ দিয়ে অন্য একটি সম্ভ্রান্ত, সম্মানিত, ভদ্র, সতী ও পবিত্র নারীকেই খুঁজবে। কেননা, সে কখনোই চাইবে না যে তার স্ত্রী হোক একজন নষ্টনারী, ঘরের পরিচালিকা হোক একজন নিকৃষ্ট মহিলা এবং তার সন্তানের মা হোক একজন ব্যভিচারিণী। নিজে ফাসেক ও পাপী হয়েও সে চাইবে তার স্ত্রীটি হোক ফুলের মতো পবিত্র। এমন কি যখন সে



নিজের পাপ ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য পাপের বাজারে কোনো পাপিষ্ঠ নারীকে খুঁজে পাবে না এবং বিয়ে ছাড়া নিজের যৌনচাহিদা পূর্ণ করার কোনো রাস্তা খুঁজে পাবে না তখন সে ইসলামের সুন্নাত অনুযায়ী বিয়ের মাধ্যমে কাউকে নিজের স্ত্রী বানানোর সন্ধানে বের হবে। সে কোনো পতিতাকে বা নষ্ট মহিলাকে কখনোই ঘরের স্ত্রী বানাতে রাজি হবে না।

আমার মেয়ে!
তুমি তোমার বোনদের বলো– হে বোন! তুমি কি জানো পুরুষেরা কেন তোমার কাছে আসতে চাই? কেন তোমাকে নিয়ে ভাবে? কারণ তুমি খুব সুন্দরী এবং যুবতী। সে তোমার সৌন্দর্যের পাগল। তাই সে তোমার চারপাশে ঘুরে এবং তোমাকে নিয়েই ভাবে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, তোমার এই যৌবন ও সৌন্দর্য্য কি চিরকাল থাকবে? দুনিয়াতে কোনো

জিনিস কি চিরস্থায়ী হয়েছে? শিশুর শিশুকাল কি শেষ হয় না? সুন্দরীর সৌন্দর্য্য কি আজীবন থাকে?

তোমার বোন যদি বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠনে আত্মনিয়োগ না করে এবং ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়ে ইসলামি পারিবারিক জীবনের গণ্ডির বাইরে চলে যেতে চায় তাহলে তাকে প্রশ্ন করো– হে বোন! তুমি যখন বৃদ্ধ হবে, যখন তোমার পিঠ ও কোমর বাঁকা হবে এবং দেহের সৌন্দর্য বিলীন হবে তখন কে তোমার দায়িত্ব নেবে? তোমার পরিচর্যাই বা করবে কে? তা কি তোমার জানা আছে? যারা তার সেবা করবে, তারা হচ্ছে তার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি। আর সে রাণীর মতো সিংহাসনে বসে পরিবারের অন্যদেরকে পরিচালনা করবে। এখন তুমি চিন্তা করো, তুমি কী করবে? বিবাহের মাধ্যমে তুমি কি এক নির্মল শান্তির সংসার রচনা করবে, না ব্যভিচারিণী হয়ে স্বল্প সময় উপভোগ করে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেবে? স্থায়ী সুখের বিনিময়ে অস্থায়ী সুখ ক্রয় করা কি কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হবে? যুবক বয়সের বিনিময়ে বিলাসিতা কি শেষকালের করুণ পরিণতির সমান হবে? কখনোই হবে না। ইউরোপ ভ্রমণকারী এক পর্যটক বলেন, আমি বেলজিয়ামের কোনো এক শহরের রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় পথচারী পারাপারের জন্য সিগন্যাল খুলে দেয়া হলে দেখলাম একজন বৃদ্ধা রাস্তা পার হতে চাচ্ছে। সে এতোই দুর্বল ছিলো যে, তার হাত-পা কাঁপছিলো। গাড়িগুলো প্রায় তার উপর দিয়ে উঠে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিলো। কেউ তার হাত ধরছিলো না। আমার সাথের একজন যুবককে মহিলাটির হাত ধরে সাহায্য করতে বললাম। তখন ৪০ বছর যাবৎ বেলজিয়ামে বসবাসকারী আমার বন্ধু বললেন, এই মহিলাটি এক সময় এই শহরের অন্যতম সুন্দরী হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত ছিলো। পুরুষেরা তার উপর দৃষ্টি ফেলার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো, তার সংস্পর্শ পেতে পকেটের অর্থ খরচ করতো এবং তার সাথে একবার হলেও করমর্দন করার প্রচেষ্টা করতো। এই মহিলাটির যখন যৌবন ও সৌন্দর্য্য চলে গেলো, তখন তার হাত ধরে একটু সাহায্য করার জন্য একজন লোকও সে পাচ্ছে না! এ রকম ঘটনা একটি নয়; শত শত পাওয়া যাবে।

আমার আত্মজা!

তোমার পথহারা বোনদেরকে এ সব কথা বলে উপদেশ দাও, তাদেরকে মর্মান্তিক করুণ পরিণতির কথা শোনাও। ইউরোপ-আমেরিকার যুবতীদের পথ ধরা থেকে তোমার ঈমানদার বোনদেরকে সতর্ক করো এবং রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তাদের মধ্যে প্রতিষেধক রোপন করো।

আমার রাজকুমারী!

আমি এ কথা বলছি না যে, তোমার প্রচেষ্টায় মুসলিম নারীরা এক লাফে প্রথম জামানার মুসলিম নারীদের মতো হয়ে যাবে। এটি অসম্ভব। কারণ বর্তমানে মুসলিম নারীরা যে অবস্থায় এসে পৌছেছে, তা এক লাফে এসে পৌছে নি। তারা প্রথমে মাথার চুলের একাংশ খুলেছে, তারপর পুরোটাই। অতঃপর কাপড় ছোট করতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে তারা জাতির পুরুষদের গাফলতির সুযোগে বর্তমানের দুঃখজনক পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। তারা হয়তো কল্পনাও করতে পারেনি যে, বিষয়টি এ পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে।

তুমি যদি ছোট একটি ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকাও তাহলে দেখবে, সেটি নড়ছে না; বরং আপন স্থানেই অবস্থান করছে। তুমি যদি দুই ঘণ্টা পর পুনরায় ঘড়ির কাছে ফেরত আসো তাহলে দেখবে ঘড়ির কাঁটা এখন আগের স্থানে নেই। দেখবে সেটি অনেক অগ্রসর হয়েছে। এমনিভাবে শিশু জন্মগ্রহণ করে একদিনেই যুবক হয়ে যায় না এবং যুবক হয়ে এক লাফে বৃদ্ধে পরিণত হয় না; বরং দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অতিক্রম করার মাধ্যমে সে বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করে। এমনিভাবেই জাতির অবস্থা পরিবর্তন হয় এবং ভালো থেকে মন্দ ও মন্দ থেকে ভালোর দিকে ধাবিত হয়।

অশ্লীল পত্রিকা, নিকৃষ্ট ম্যাগাজিন, উলঙ্গ সিনেমা, বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, ইন্টারনেট, ফাসেক ও পাপিষ্ঠদের প্ররোচণা সর্বোপরি মুসলিম নারীদেরকে নষ্ট করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ইসলামের শত্রুদের অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে বর্তমান মুসলিম নারীর অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌছেছে, যা ইসলাম ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে।

টিভি চ্যানেলে দেখা যায় একজন যুবক একজন যুবতী মেয়েকে হাত ধরে নাচাচ্ছে, পরস্পর জড়িয়ে ধরছে, গালে গাল ও বুকে বুক লাগাচ্ছে। টিভির পর্দার সামনে কি সেই মহিলার পিতা-মাতা ও যুবক-যবতী ভাই-বোন থাকে না? এ ধরনের পিতা-মাতা কি তাদের এই নায়িকা মেয়েটিকে চিনতে পারে না? তারা কি মুসলিম নয়? কোন মুসলিম কি তার মেয়েকে এই অবস্থায় দেখতে পছন্দ করতে পারে? এই দৃশ্য কি চোখ খুলে দেখতে পারে? তার মেয়েকে নিয়ে অন্য একজন পুরুষ এভাবে খেলা করবে আর সে তা উপভোগ করবে- এটি কোনো মুসলিম কি সমর্থন করতে পারে? ইসলাম তো দূরের কথা, এমনকি খৃষ্টান ও অগ্নিপূজকদের ধর্মও তা সমর্থন করে না। তাদের ইতিহাস পাঠ করলেই এ কথার প্রমাণ মিলে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ কিছু মুসলিম দেশে মুসলিম নারী-পুরুষের চারিত্রিক অবস্থা এই পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে, মানুষ তো দূরের কথা; পশুরাও তা গ্রহণ করতে পারে না।

দুটি মোরগ যখন একটি মুরগীর নিকটবর্তী হয়, তখন মুরগীটিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেওয়ার জন্য মোরগ দু'টি পরস্পর ঝগড়া করে এবং একটি অন্যটিকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তুমি দেখবে যে, মিসর, লেবানন বা বাংলাদেশের কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতসমূহে এবং ঢাকার পার্কসমূহে মুসলিম নারীদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তাদের মুখ, মাথা, পেট, পিঠ এমন কি সবই উন্মুক্ত। শুধু তাই নয়; অবস্থা এ পর্যায়ে পৌছেছে যে, দু'জন পুরুষ মিলে একজন মহিলাকে ভাগাভাগি করে উপভোগ করছে। এই অবস্থা কি কোনো পশু সমর্থন করে? একটি মোরগ কি চায় যে, তার আয়ত্তের মুরগীটির উপর আরেকটি মোরগ এসে আরোহন করুক?

ব্যভিচার শুধু মানবজাতির কাছেই ঘৃণিত নয়, কিছু কিছু বন্যপশুও এই অপরাধকে ঘৃণা করে।

সহিহ বোখারিতে এই মর্মে আমর বিন মায়মুন থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন– 'ইয়ামানে থাকাবস্থায় আমি একদা একটি উঁচু স্থানে ছাগল চরাচ্ছিলাম। দেখলাম একটি পুরুষ বানর একটি নারী বানরের হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে আছে। পুরুষ বানরটির চেয়ে কম বয়সের আরেকটি বানর এসে স্ত্রী বানরটিকে খোঁচা মারলো। এতে স্ত্রী বানরটি পুরুষ বানরের মাথার নিচ থেকে চুপচাপ হাত বের করে আগত কমবয়সী বানরটির পিছে চলতে থাকলো। কিছুদূর গিয়ে বানরটি স্ত্রী বানরের সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হলো। তারপর স্ত্রী বানরটি ফিরে এসে ধীরে ধীরে তার যুগলের (স্বামীর) গালের নিচে হাত রাখার চেষ্টা করতেই সে পেরেশান হয়ে জেগে উঠলো। স্ত্রী বানরটির শরীরের গন্ধ পেয়েই চিৎকার করতে শুরু করলো। এতে একদল বানর একত্রিত হলো। পুরুষ বানরটি চিৎকার করে হাতের মাধ্যমে স্ত্রী বানরটির দিকে ইঙ্গিত করে ব্যভিচারের কথাটি অপরাপর বানরকে বুঝাতে লাগলো। বানরগুলো ডানে বামে খোঁজাখুঁজি করে অপরাধী বানরটি ধরে নিয়ে এলো। আমর বিন মায়মুন বলেন, আমি সেই বানরটিকে চিনে রেখেছিলাম। তারা উভয়ের জন্য গর্ত খনন করলো এবং তারা উভয়কে রজম করলো। আমর বিন মায়মুন বলেন, আমি বনিআদম ছাড়া অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যেও রজম দেখেছি।

অন্য বর্ণনায় আমর বিন মায়মুন বলেন, বানরগুলোর পাথর মারার দৃশ্য দেখে আমি ধৈর্যধারণ করতে না পেরে আমিও তাদের সাথে পাথর মারলাম।

মুসলিম দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মুসলিম যুবতীরা মুসলিম যুবকদের পাশেই মাথা, মুখ ও বুক খুলে বসছে। মুসলিম পিতা-মাতাগণ স্বেচ্ছায় তাদের কন্যাদের জন্য এটিকেই বেছে নিচ্ছে।

আমার ছোট্ট পাখি!

মুসলিম মেয়েদের এই অবস্থা একদিনে পরিবর্তন হবে না। এক লাফে তারা পূর্বেই সেই আসল অবস্থায় ফিরে যাবে না; বরং আমরা সেভাবেই তাদেরকে ধীরে ধীরে পূর্বের অবস্থায় ফেরত নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো, যেভাবে পর্যায়ক্রমে তারা বর্তমানের করুণ ও দুঃখজনক অবস্থায় এসে পৌছেছে।

আমাদের সামনে পথ অনেক দীর্ঘ। পথ যদি অনেক দীর্ঘ হয়, আর তার বিকল্প সংক্ষিপ্ত অন্য পথ না থাকলে যে ব্যক্তি পথ দীর্ঘের অভিযোগ করে যাত্রা শুরু করবে না, সে কখনোও তার গন্তব্য স্থানে পৌছাতে পারবে না।



আমার আদরের মেয়ে!

তুমি প্রথমে মুসলিম নারীদের পুরুষদের সাথে খোলামেলা উঠা-বসা, চলাফেরা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বেপর্দা হয়ে সহশিক্ষায় প্রবেশ করতে নিষেধ করো। সেই সাথে সহশিক্ষার খারাপ দিকগুলো তুলে ধরো। তুমি তাদেরকে মুখ ঢেকে রাখতে বলো। যদিও ফেতনার আশঙ্কা না থাকলে আমি মুখ ঢাকাকে ওয়াজিব মনে করি না। মুখ খুলে রাস্তায় চলার চেয়ে নির্জনে মুখ ঢেকে পুরুষের সাক্ষাৎ করা অধিক বিপদজনক, স্বামীর অনুপস্থিতে তার ঘরে স্বামীর বন্ধুর সামনে বসে গল্প করা, আপ্যায়ন করা আর পাপের দরজা খুলে দেয়া একই কথা। ভার্সিটিতে সহপাঠীর সাথে মুসাফাহা করা অন্যায়, তার সাথে অবিরাম কথা ও টেলিফোন চালিয়ে যাওয়া ক্ষতিকর, এক সাথে বিদ্যালয়ে যাওয়া অনুচিত, বান্ধবীর সাথে গৃহশিক্ষকের রুমে একত্রিত হওয়া অপরাধ।

মেয়ে আমার!

তুমি এ বিষয়টি ভুলে যেও না, আল্লাহ তোমাকে নারী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর তোমার সহপাঠীকে বানিয়েছেন পুরুষ। তোমাদের পত্যেকের মধ্যেই এমন উপাদান যুক্ত করা হয়েছে, যার কারণে তোমাদের একজন অন্যজনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সুতরাং তোমাদের কেউই এমন কি পৃথিবীর সকল মানুষ মিলে চেষ্টা করলেও আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন আনয়ন করতে সক্ষম নয়। তারা কখনোই নারী-পুরুষের ব্যবধান উঠিয়ে দিয়ে উভয়কে সমান করতে পারবে না এবং নারী-পুরুষের পরস্পরের দিকে আকর্ষণকে ঠেকাতে পারবে না।

যারা সভ্যতার নামে নারী-পুরুষের মধ্যকার ব্যবধান উঠিয়ে দিতে চায় এবং উভয় শ্রেণীর জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে কর্মক্ষেত্রে মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানায় তারা মিথ্যুক। কারণ এর মাধ্যমে তারা নিজেদের মনের চাহিদা মেটাতে চায় এবং অন্যের স্ত্রী-কন্যাকে পাশে বসিয়ে নারীদের সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে চায়। সেই সাথে আরও কিছু করার সুযোগ পেলে তাও করতে চায়। কিন্তু এ কথাটি এখনও তারা খোলাসা করে বলার সাহস পাচ্ছে না। সুতরাং তারা নারীদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা, সভ্যতা ও উন্নয়নের যে সুর তুলছে তা নিছক সস্তা বক্তব্য ছাড়া আর কিছু নয়। এ সমস্ত কথার পিছনে তাহজিব-তামাদ্দুন, সভ্যতা, উন্নতি অর্জন আদৌ তাদের উদ্দেশ্য নয়।

তারা যে মিথ্যুক তার আরেকটি কারণ হলো, যে ইউরোপ-আমেরিকাকে তারা নিজেদের আর্দশ মনে করে এবং যাদেরকে তারা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও উন্নতির পথ প্রদর্শক মনে করে মূলত তারা প্রকৃত উপলব্ধি করতে পারেনি। তারা যেটিকে সভ্যতা ও সংস্কৃতি মনে

করছে, তা মূলত সত্য ও সভ্যতা নয়; বরং সেটি হচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত সভ্যতা। তাদের ধারণায় নাচ, গান, বেহায়াপনা, উলঙ্গ অর্ধউলঙ্গ হওয়া, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষায় অংশ নেওয়া, নারীদের খেলার মাঠে নামা এবং সমুদ্র সৈকতে গিয়ে বস্ত্রহীন হয়ে গোসল করাই সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানদণ্ড। আর প্রাচ্যের দেশ তথা মুসলিমদের মসজিদ-মাদরাসা, মদিনা, দামেস্ক এবং আল-আজহার বিদ্যালয়সহ সকল ইসলামি প্রতিষ্ঠানে যে উন্নত চরিত্র, সুশিক্ষা, নারী-পুরুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাদের ধারণায় তা মুসলিমদের পশ্চাৎমুখী হওয়ার এবং সভ্যতাও সংস্কৃতির দিক থেকে পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ।

ইউরোপ-আমেরিকা থেকে ঘুরে আসা বা সেখানে বসবাসকারী অসংখ্য পরিবার নারী-পুরষের খোলামেলা চলাফেরাতে সন্তুষ্ট নয় এবং এটি তাদেরকে শান্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই আজ তারা বিকল্পের সন্ধান করছে।

আমার মেয়ে!

ইউরোপ-আমেরিকায় এমন অসংখ্য পিতা-মাতা আছে, যারা তাদের যুবতী মেয়েদেরকে যুবক পরুষদের সাথে চলাফেরা করতে ও মিশতে দেয় না। তারা তাদের সন্তানদের সিনেমায় যেতে দেয় না। শুধু তাই নয়; তারা তাদের ঘরে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনামুক্ত চ্যানেল ব্যতীত অন্য কিছু ঢুকায় ন। অথচ পরিতাপের বিষয় হচ্ছে আজ অধিকাংশ মুসলিম দেশের মুসলিমদের ঘর এগুলো থেকে মুক্ত নয়।

এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর কথা হচ্ছে, সহশিক্ষা প্রবল যৌন আকাঙ্ক্ষাকে দমন করে, চরিত্র সংশোধন করে এবং দেহ থেকে বাড়তি যৌন চাহিদাকে দূর করে দেয়। আমি তাদের জবাবে বলতে চাই যে, আপনারা কি রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখেন না? যে রাশিয়া কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে না, কোনো পাদ্রীর উপেদেশে কর্ণপাত করে না, তারা কি সহশিক্ষা ও নারী-পুরুষের সহঅবস্থানের খারাপ পরিণামের শিকার হয়ে তা থেকে ফেরত আসার ঘোষণা দেয়নি?

আমেরিকার প্রসঙ্গে আসি। পত্র-পত্রিকার রিপোর্টে প্রকাশ হচ্ছে, অবিবাহিত ছাত্রীদের মধ্যে গর্ভবতীর সংখ্যা সেখানে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি তাদের অন্যতম একটি বিরাট সমস্যা। আপনারা কি মুসলিম দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও এমন সমস্যা দেখতে চান?

বর্তমানে সময়ে আমেরিকা এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যৌনসচেতনতা বা সেক্সশিক্ষা নামে একটি বিষয় সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করে তা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পাঠদান করছে। আমি মনে করি এর মাধ্যমে তারা আগুনের মধ্যে পেট্রোল ঢালছে। অল্পবয়স্ক নির্দোষ বালিকার মধ্যে লুকায়িত যৌন স্পৃহাকেই তারা জাগিয়ে তুলছে। স্কুল পর্যায়ের ছাত্রীদেরকে তারা কন্ডম ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং একজন পুরুষ নির্জনে একজন মহিলার সাথে কী করে তারা উঠতি বয়সের বালিকাদেরকে তাও শিক্ষা দিচ্ছে। আমাদের মধ্যে বসবাসকারী এক ধরণের মানুষ নামধারী শয়তান আমাদেরকেও তাদের কর্মকাণ্ডের অনুসরণ করার আহবান জানাচ্ছে।

আমার মানিক!

আমি এ কথা বলছি না, যুবকেরা তোমার কথা অবনত মস্তকে মেনে নেবে। আমি জানি তারা তোমায় প্রত্যাখ্যান করবে এবং তোমাকে বোকা বলবে। কারণ তারা মনে করবে যে, তুমি তাদেরকে যৌবনের স্বাদ উপভোগ করতে বাধা দিচ্ছো এবং তাদেরকে ভোগের সমুদ্রে সাঁতার কাটাতে মানা করছো। সুতরাং তুমি যুবকদেরকে এটা বলতে যাবে না; বরং তুমি উপদেশ দেবে তোমার মুমিন-মুসলিম বোনদেরকে, মেয়েদেরকে। সতর্ক করবে আমার স্নেহের কন্যাদের। কেননা ইবলিসের ফাঁদে পড়ে তোমার বোনেরাই পথভ্রষ্ট হয় এবং তারাই ভিকটিমে পরিণত হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ যেনো এমন কাজে অগ্রসর না হয়, যার পরিণাম শুভ হয় না। যারা নারীর স্বাধীনতার গান গায়, তাদের উন্নয়নের কথা বলে, তাদেরকে সহশিক্ষা ও পর্দাহীন মেলামেশার আহবান জানায় তোমরা তাদের কথায় কর্ণপাত করো না। কারণ এ সমস্ত শয়তানদের অধিকাংশের স্ত্রী-সন্তান ও পরিবার নেই। তারা কেবল তোমাদেরকে উপভোগ করতে চায়।

আমার কন্যা! তুমি তোমার বোনদেরকে বলো, আমি তোমাদেরকে যে উপদেশ দিচ্ছি, তার বিনিময়ে আমি কিছুই চাই না। শুধু তোমাদেরকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই, তোমাদের কল্যাণ চাই, পবিত্র জীবনের সন্ধান দিতে এবং আমি নিজের জন্য যা ভালোবাসি, তোমাদের জন্যও তাই কামনা করি।

আমার মেয়ে!

এদের কবলে পড়ে কোন নারী যদি তার অমূল্য সম্পদ হারায়, তার মর্যাদা নষ্ট হয় এবং সম্ভ্রম ও সতীত্ব চলে যায়, তাহলে তার হারনো সম্মান দুনিয়ার কেউ পুনরায় ফেরত দিতে পারবে না। কোনো নারী যদি স্বীয় ইজ্জতহারা হয়ে সমাজ থেকে ছিটকে পড়ে কেউ তার হাত ধরবে না এবং তার দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করবে না। অথচ যতোদিন সেই নারীর শরীরে যৌবন অবশিষ্ট ছিলো ততোদিন পাপিষ্ঠরা তার সৌন্দর্যের চারপাশে ঘুরঘুর করেছে এবং তার প্রশংসা করেছে। যৌবন চলে যাওয়ার সাথে সাথেই কুকুর যেমন মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণ করে হাড্ডীগুলো ফেলে রেখে চলে যায় ঠিক তেমনি তারা তাকে রেখে দূরে চলে যায়।

হে আমার মেয়ে!

এই ছিলো তোমার প্রতি আমার সংক্ষিপ্ত উপদেশ। তোমাকে যা বললাম, তাই সত্য। এটি ছাড়া কেউ যদি তোমাকে অন্য কথা বলে, তুমি তা বিশ্বাস করো না। জেনে রেখো! তোমার হাতেই তোমাদের ও পুরুষদের সংশোধনের চাবিকাঠি; আমার হাতে নয়। তুমি চাইলে নিজকে, তোমার বোনদেরকে এবং সমগ্র জাতিকে সংশোধন করতে পারো। তোমার উপর আল্লাহর পক্ষ হতে শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

ইতি
তোমার পিতা
০৮. ০৬. ১৪৩৩ হিজরি



স্যামসাং 'গ্যালাক্সি এস ফোর

আতিক রহমান

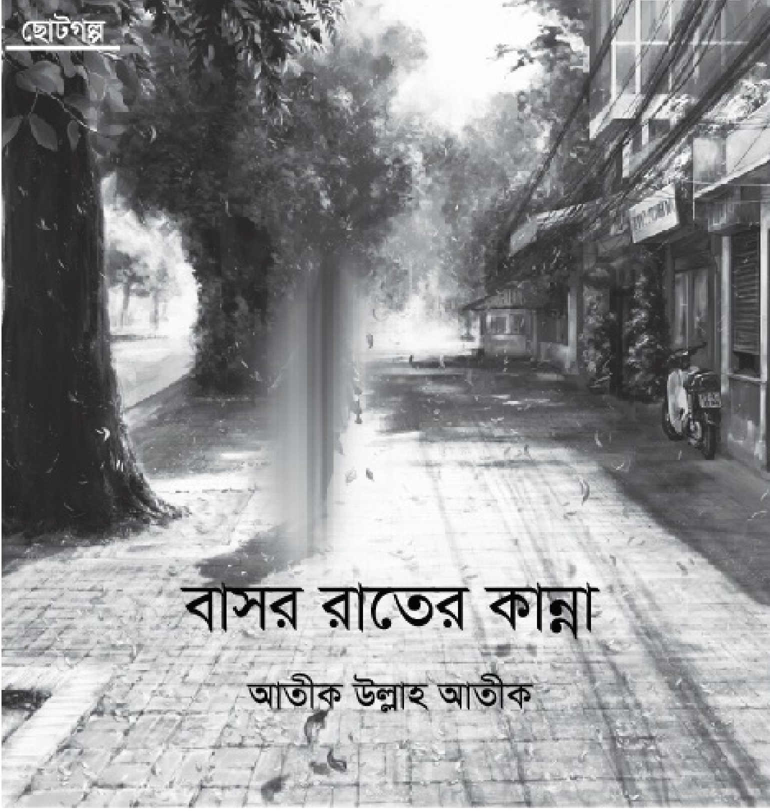
হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় মজনুর মাথায় এক ধরনের ভোতা যন্ত্রণা হচ্ছে। মজনু কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে পুনরায় ঘুমাতে না পেরে মহা বিরক্ত হয়ে 'ধুশ শালা' বলে বিছানায় উঠে বসলো, কয়টা বাজে?

মজনু বালিশের নিচ থেকে গত রাতে চুরি করে আনা মোবাইলটা বের করে দেখলো ৮ : ১৫।

এত সকালে মজনুর ঘুম ভাঙে না। মজনু সারারাত 'ধান্ধা' করে প্রায় ভোরের দিকে ঘুমুতে যায়, রোজ। সেই ঘুম ভাঙে দুপুর ১টায়, যখন দক্ষিণ কুতুবখালীতে সমস্বরে মাইকে আজানের ধ্বনি বেজে ওঠে। মজনু বিছানা ছেড়ে মোবাইলটা লুঙ্গির ভাঁজে লুকিয়ে ছাদে ওঠে এলো। ছাদের যে পাশটা মসজিদ সংলগ্ন সেখানে বসে মোবাইলটা নেড়ে চেড়ে দেখলো। ভালোই, স্যামসং; বেচলে ভালো দাম পাওয়া যাবে। ঘুমের ক্লান্তি দূর হয়ে মোবাইল বিক্রি বাবদ অচিরেই কিছু টাকা হাতানো যাবে- এই আনন্দে মজনুর চেহারায় একটা অস্ফুট হাসির রেখা ফুটে ওঠলো।

মজনু ঢাকার ছেলে, ঢাকাইয়্যা পোলা। ঢাকার রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, অলি-গলিতে ঘুরে, বিরিং-লাটিম খেলে মজনুর শৈশব কেটেছে। তাই ঢাকায় তার কোনো ভয় ডর নেই। যখন যা ইচ্ছে হয় করে। মজনুর বয়স এখন ২৪। কুতুবখালীর একটি ছোটখাটো গ্যাংয়ের নেতা সে। সুযোগ পেলে গলির মুখে ছিনতাই, রাস্তার ধারে ইভটিজিং, নদীর ওপারে গিয়ে বাংলা খাওয়া বা শুক্রবার রাতে পাড়ার কোনো ফাঁকা ছাদে বাবা ওরফে ইয়াবা খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকা মজনুর কাজের তালিকায় রয়েছে। ইদানীং কাজের তালিকায় যোগ হয়েছে এর তার কাছ থেকে কৌশলে মোবাইল হাতিয়ে নেওয়া। দেখা গেলো কারো সঙ্গে মজনু গল্প করছে বা কথা বলছে হঠাৎ তার মোবাইলটা দেখবে বলে চেয়ে নিলো বা এমনি নিলো। তারপর অনেকক্ষণ গল্প করে সজ্ঞানে মোবাইলটা তাকে ফিরিয়ে না দিয়ে নিয়ে চলে এলো। অতপর যখন যার মোবাইল সে মোবাইলটা ফিরিয়ে নিতে মজনুর কাছে আসে মজনু দিব্যি অস্বীকার করে বসে– 'তর মোবাইল আমি নিমু ক্যালা? আমি কি চোর নিহি।' এই অকাস্মাৎ ঝারিতে মোবাইলওয়ালা টাসকি খেয়ে চলে যায় বা ঝামেলা বাঁধায়– 'দেখ মজনু ফাইজলামি করিস না, ভালোয় ভালোয় মোবাইলটা দিয়া দে, নাইলে আমি কইলাম কাকাতে (মজনুর বাপ-নাম ছাদম) কমু'।

এই সমস্ত খুচরা ঝামেলা মজনু গায়ে মাখে না। মোবাইলওয়ালার চেয়ে দ্বিগুণ উত্তেজিত হয়ে পুরো এলাকায় শোরগোল বাঁধিয়ে দেয়– 'নাটকির পো, তুই আমারে থ্রেট দেস! তুই আমার বাইত্তে আইয়া আমার কছ আমি চোর। তর ছাহস ত কম না। ঐ বেটা আমার কি মোবাইলের অভাব নিহি। হপ্তায় হপ্তায় পাল্টাই।'
মজনুর হৈ চৈ শুনে পুরো বাড়ির ছোট থেকে বড় ছেলেমেয়ে সবাই মজনুর পক্ষ নিয়ে এগিয়ে আসে। সবার আগমনে সিচুয়েশন উল্টা দিকে মোড় নিতে দেখে মোবাইলওয়ালা অসহায় হয়ে কেটে পড়ে।
এই হলো মজনুর ইদানীংকালের মোবাইল চুরির কৌশল। অবশ্য দু'য়েকটা ঘটনা ঘটার পর মজনু যাদের সাথে মিশে তারা মোবাইলের ব্যাপারে মজনু থেকে সতর্ক হয়ে গেছে।
গতরাতে মোবাইলটা মজনু যার কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে সে কুতুবখালীর আরেক উদীয়মান মাস্তান- নাম কামিল। মোবাইলটা মূলত কামিলের না, তার বোনের। তার বোনের নতুন বিয়ে হয়েছে। স্বামী শখ করে কিনে দিয়েছে Samsung galaxy s4। কামিল বোনের কাছ থেখে মোবাইলটা নিয়ে বন্ধুদের কাছে একটু ভাব নিতে চেয়েছিলো, বন্ধুদের আড্ডায় গিয়ে দেখে সেখানে ধুমছে বাবা টানা হচ্ছে। কামিল লোভ সামলাতে না পেরে তাদের সাথে বসে পড়লো এবং কিছুক্ষণের মাঝেই নেশার উর্ধ্বজগতে চলে গেলো।
মজনু এই সুযোগটা নিলো, আলতো করে সবার অগোচরে কামিলের বা পকেট থেকে মোবাইলটা নিয়ে সটকে পড়লো। এটা রাত ২ : ২০ এর ঘটনা। কামিল নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে বাসায় গিয়ে কারো সাথে কোনো কথা না বলেই ঘুমিয়ে পড়লো। মোবাইলের কথা মনে পড়লো না। মনে পড়লো পরদিন সকালে যখন বোন এসে ঘুম ভাঙিয়ে বলল– 'ঐ আমার মোবাইলটা দে, তর দুলাভাই কখন থেকে ফোন দিতাছে, মোবাইল নাকি বন্ধ পায়?'
কামিল ধরফর করে উঠে প্যান্টের বা পকেটে হাত দিলো– নাই। ডান পকেটে হাত দিলো– নাই। কামিল হাত মুখ না ধুয়েই বাসিমুখে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলো। উত্তর কুতুবখালীর রইসের কাছে যেতে হবে। মজনু মোবাইল হাতিয়ে ওর কাছেই বিক্রি করে। যাওয়ার আগে বোনকে বলে গেলো 'খাড়া, অক্ষনই আইতাছি'।
রইসকে বাসায় পাওয়া গেলো না। কামিল ফোন দিলো– ঐ বেটা তুই কৈ?
রইস বললো– গরু কিনতে বাপের লগে গাবতলী, আইতে সন্ধ্যা অইব।
কামিল ফোনেই জিজ্ঞেস করলো– মজনুর লগে তর আইজগা কথা হইছে, হাচা কইরা ক?
হ, ক্যালা কী অইছে?
: মজনু কোনো মোবাইল বেচনের কথা কইছে?
: হ, কইছে। ক্যালা, তর মোবাইল চুরি হইছে নিহি?
কামিল আর কথা না বাড়িয়ে মজনুর বাড়ির দিকে রওনা দিলো।
ততক্ষণে দক্ষিণ কুতুবখালীতে দুপুর নেমে এসেছে। আকশে রোদ নেই, মেঘের ঘনঘটা। একটা বৃষ্টির খুব প্রয়োজন। মানুষগুলো গরমের যন্ত্রণায় কতোদিন সুখ করে ঘুমুতে পারে না। তাছাড়া ওয়াশা লাইনে পানির অভাব দেখা দিয়েছে, বৃষ্টি হলে সেই অভাবের কিছুটা লাঘব হয়।
কামিল সরাসরি মজনুর ঘরে এসে ঢুকলো। মজনু বিছানায় বসে টিভি দেখছিলো।
: কিরে কামিল, তুই?
কামিল কোনো ভণিতা ছাড়াই বললো– দেখ মজনু, সেটটা আমার না, আমার বইনের। আমি বইনেরে কথা দিয়া আইছি অর সেট ওরে ফিরায়া দিমু। ভাইনা ভালা, সেটটা দিয়া দে।
মজনু খুব স্বাভাবিকভাবে গলায় ও আচরণে যথেষ্ট বিস্ময় মেখে বললো, তুই এগলা কী কছ? তর সেট আমি নিমু ক্যালা, পাগলে পাইছে!'
কামিল আর কোনো কথা খুঁজে পেলো না। বোনের সামনে কিভাবে মুখ দেখাবে এই লজ্জায় তার চোখে পানি চলে এলো। কামিল ছলোছলো নয়নে বললো– মজনু তুই আমারে অপমান করলি। এর প্রতিশোধ আমি লমুই লমু।
মজনু একটা উপেক্ষার হাসি দিয়ে পুনরায় টিভি দেখায় মন দিলো।
অন্য কেউ হলে বিষয়টা এখানেই শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু কামিল অত সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। কামিল লোক জোগার করতে লাগলো, কয়েক জায়গায় ফোন দিলো। কিছু অস্ত্রও লাগবে।
কুতুবখালীতে বিকেল তিনটা থেকে টানা বৃষ্টি হচ্ছে। এখন বাজে সন্ধ্যা ৭টা। রাস্তাঘাট পানিতে সয়লাব। রাস্তা ও ড্রেনের পানি একাকার হয়ে অনেকের বাড়িতে ঢুকে গেছে। বাড়ির বৌ ঝিরা সেই পানি সামলাতে ব্যস্ত। মজনু এই ঝুম বৃষ্টিতে ছাদে ওঠে এলো। অনেকদিন বৃষ্টিতে ভেজা হয় না। শরীরে বিস্তর ঘামাছি হয়েছে। বৃষ্টিতে ভিজলে কিছুটা আরাম হবে।
কামিল সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে আগে থেকেই ছাদের কার্নিশে একটা ধারালো অস্ত্র নিয়ে মজনুর অপেক্ষায় বসে আছে। কামিল একাই এসেছে, বৃষ্টিতে আর কেউ আসতে রাজি হয়নি। মজনু ছাদে উঠে উদাস হয়ে ভিজতে লাগলো। মজনুর মনে বেজায় আনন্দ। সেট নিয়ে রইসের সঙ্গে কথা হয়েছে, ভালো দাম পাওয়া যাবে।
মজনু ভিজতে ভিজতে ছাদের পূর্ব কিনারে গিয়ে দাঁড়ালো। বৃষ্টির তোড় বেড়েই চলেছে। কামিল আর সময় ক্ষেপন করলো না। সন্তর্পণে ধারালো অস্ত্রটা শক্ত করে ধরে পিছন দিক দিয়ে গিয়ে মজনুর উদোম পিঠে একটা কোপ বসিয়ে দিল। মজনু 'ও মা গো' বলে একটা চিৎকার দিয়ে ছাদের পিচ্ছিল মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো। কামিল ফিসফিস করে মজনুর কানের কাছে এসে বললো– সেটটা কৈ রাখছছ ক? নাইলে জানে মাইরা হালামু।
মজনু কোনো উত্তর দিলো না। শুধু গো গো শব্দ করে কামিলকে একটা গালি দিলো। মজনুর চিৎকার শুনে ততক্ষণে দৌড়ে ছাদের দিকে মানুষ আসতে লাগলো। কামিল মোবাইলের কথা ভুলে মসজিদের কার্নিশ ধরে পালিয়ে গেলো।
বাড়ির সবাই এসে দেখলো মজনুর লাল রক্ত বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে ছাদ থেকে রাস্তায় টপটপ করে ঝরে পড়ছে। যেন কেউ কাঁচা সুপারি দিয়ে দেশি পান খেয়ে পিক ফেলেছে।



বাসর রাতের কান্না

আতীক উল্লাহ আতীক

এক মেয়ের স্মৃতিচারণ–

আমি আমার হবু স্বামীকে আগে কখনো দেখিনি, পরিচয় তো দূরের কথা। তার সাথে বাসররাতেই প্রথম দেখা।

সারাদিনের ব্যস্ততা শেষ হয়ে গেছে। আমাকে বাসরঘরে দিয়ে সবাই ঘুমুতে চলে গেছে। আমি একাকী বসে আছি। স্বামীর অপেক্ষায়। ইন্তিজারে। তিনি এলেন। আমি মাথা নুয়ে পালঙ্কের ওপর বসে আছি। জড়োসড়ো। অবগুণ্ঠিত। কুণ্ঠিত। অবনতমস্তক।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে আছি। ভাবছি তিনি পুরুষ তিনিই তো আগে বেড়ে কথা বলবেন। আড় ভাঙবেন। কিন্তু তার পক্ষ থেকে কোনো সাড়া শব্দ নেই। আমি ভয় পেতে শুরু করলাম। উদ্বেগ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগলো। লজ্জা ক্রমশ আতংকে পরিণত হচ্ছিলো।

লোকটা কথা বলছে না কেন? কিছু করছে না কেন? আমার কাছে আসছে না কেন? তার কী হয়েছে? আমি ভাবনার অতলে ডুবে থেকেই অজান্তে পাশ ফিরে বসলাম। দৃষ্টি তখনো নিচের দিকে অবনতই আছে। মানুষটা কি এতোটাই লাজুক, না আমাকে পছন্দ হয়নি? আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

নাহ, এটা হতে পারে না। আমাকে পছন্দ না করার তো কোনো কারণ নেই। অন্তত সৌন্দর্যের বিবেচনায়। আমি জানি, আমার পরিবার জানে আমি দেখতে-শুনতে হেলাফেলার নই। এটা সেই ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি।

আর মানুষটা তো আমাকে আগেই দেখেছে। তখনও অবশ্য আমার সাথে কথা বলেনি। আমিও আর আগ বেড়ে কথা বলতে যাইনি। বেশরম বাচাল মেয়ে মনে করে বসে কিনা, তাই।

আম্মু তো একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, ছেলেরা লাজুক মেয়ে পছন্দ করে। বাচাল আর দুর্মুখ-মুখরা মেয়েকে তারা একদম দেখতে পারে না।

আমি বসে বসে বিসমিল্লাহ, লা হাওলা, আয়াতুল কুরসি, যা কিছু মনে আসছিলো সমানে পড়ে যাচ্ছিলাম। কিছুতেই কিছু হলো না। লোকটা কি বোবা? না, তা কী করে হয়! আব্বু তো বলেছেন, ছেলেটা চমৎকার গুছিয়ে কথা বলতে পারে। তার কথা বলার ভঙ্গিটা নাকি অতুলনীয়। ভাইয়াও তার বাকপ্রতিভায় সপ্রশংস। তার মুখে গল্প শুনলে নাকি মুর্দাও হাসতে শুরু করবে।

সেই কথকপ্রবর চুপটি করে থাকার কারণ কী? হঠাৎ সন্দেহ হলো, লোকটা কামরায় আছে তো আমি থাকতে না পেরে টুপ করে মুখ তুলে তাকালাম। আবার দ্রুত মুখ নামিয়ে ফেল্লাম। আমার এই নড়াচড়া লোকটা খেয়াল করলো না।

তারপর আবার ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালাম। পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে। অবাক হয়ে দেখলাম লোকটা এই দুনিয়াতে নেই। অন্য কোনও গ্রহে আছে। আমার অস্তিত্ব ভুলে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার বিষন্ন চেহারায় গভীর চিন্তার ছাপ।

অকস্মাৎ লোকটা দুলে উঠলো। আমি চমকে উঠে ভাবলাম, এবার হয়তো আমার দিকে তাকাবে। আমাকে ড্যাবড্যাব করে জুলজুল চোখে তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে কি না কী ভাবে! কিন্তু আমার ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে, লোকটা ঘড়ির দিকে তাকালো। আমার দিকে ভ্রুক্ষেপও করলো না। বসে বসে দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে লাগলো।

আমার বিস্ময় ততোক্ষণে শোকে পরিণত হয়েছে। অপমানে আমার বুক ভেঙে কান্না আসতে শুরু করলো। অনেক কষ্টে চাপা দিয়ে রাখলাম। কিন্তু চোখের আঁসু তো বাধা মানছে না। বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো বুক ভাসিয়ে দিচ্ছিলো। কান্না থামাতে গিয়ে বারবার হিক্কা উঠছিলো। গমক থামাতে গিয়ে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ বেরিয়ে গেলো। আর বাধা মানলো না মন। কান্নার আওয়াজ একটু জোরেই হয়ে গেলো। আনন্দের ক্ষেত্রটা কান্নার কারবালায় পরিণত হয়েছে। আমার আকুল কান্না দেখে লোকটা পায়ে পায়ে কাছে এলো। অদ্ভুত ঘড়ঘড়ে গলায় প্রশ্ন করলো–

: কেন কাঁদছো?

আমি জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলাম। লোকটা এবার বললো, শোনো আয়েশা,

আমি তোমাকে তালাক দিলাম।
ঘরে বাজ পড়লেও আমি এতোটা অবাক হতাম না। কামরা আগেও নীরব ছিলো, এবার যেন পিনপতন নীরবতায় ছেয়ে গেলো। আমার চোখের পানি থেমে গেলো। কাঁদতে পর্যন্ত ভুলে গেলাম। আমি হাঁ করে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। লোকটা কি মশকরা করছে? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো! আমার বুকটা পুরোপুরি ফাঁকা হয়ে গেলো। কেমন যেন চিনচিনে ব্যথা করতে লাগলো। মনে হতে লাগলো, পুরো পৃথিবী দুলে উঠেছে। চারপাশ চরকির মতো ঘুরছে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো। এরপর আর কিছুই মনে নেই। কী যে হলো বুঝতে পারলাম না।
পরদিন নিজেকে আম্মুর বিছানায় আবিষ্কার করলাম। চোখ খুলেই দেখলাম আম্মু খাটের একপাশে বসে মাথা কুটে কাঁদছেন। আব্বু জানালার ধারে একটা চেয়ারে বসে দাঁত কিড়মিড় করে বলছেন–
: সে যে আমার ওপর এভাবে প্রতিশোধ নিবে ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি। আমি তো ভেবেছিলাম সব চুকেবুকে গেছে। তোর মনে এতো বিষ থাকলে আমাকে মেরে ফেলতি। কিন্তু আমার কলিজার টুকরা মা'কে কেন।
একথা বলে আব্বুও হু হু করে কাঁদতে লাগলেন। একটু পরে ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়ালেন। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, আমি এর প্রতিশোধ নেবোই নেবো।
যার সাথে আমার বিয়ে হয়েছিলো, তার বাবার সাথে আমার আব্বুর বন্ধুত্ব সেই ছেলেবেলা থেকে। তারা ছিল গরিব। দাদাজানই সাহায্য-সহযোগিতা করে এতোদূর টেনে এনেছিলেন। পরে বিয়েও করিয়েছেন। বাবার সাথে একটা ব্যবসায় জুতে দিয়েছিলেন। ব্যবসা করতে গিয়েই সেই আঙ্কেলের আসল রূপ দিনদিন প্রকাশ পাচ্ছিলো। তিনি ষড়যন্ত্র করে আমাদের কোম্পানির মালিকানা পুরোটাই নিজের নমে করে ফেলতে চেয়েছিলেন।
আব্বু জানতে পেরে সাথে সাথে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন। আঙ্কেলকে বের করে দিয়েছিলেন। আঙ্কেল অবশ্য ততোদিনে নিজের আখের ভালোই গুছিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি এ পরাজয়কে ব্যক্তিগতভাবে অপমান হিসেবে নিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, আমি এ অপমানের প্রতিশোধ নেবো।
পরে আস্তে আস্তে আঙ্কেল নানা ছুতোয় আব্বুর কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে শুরু করলো। তার নিজস্ব কোম্পনির বিভিন্ন অনুষ্ঠান-উপাচারে আব্বুকে প্রধান অতিথি হিসেবে দাওয়াত দিতে লাগলো। আম্মু বারবার নিষেধ করেছিলেন, এমন মানুষের সাথে আর সম্পর্ক রাখার কী প্রয়োজন? এরা পারে না এমন কাজ নেই। যে লোক দিনমান প্রতিশোধ নিবে বলে হাজারবার প্রতিজ্ঞা করেছেন, সে লোক সহজে ভুলে যাবে বলে মনে হয় না।
: আরে না রেহানা, সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে।
ব্যবসা আলাদা কিন্তু আবার পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠলো। সে সম্পর্কের জের ধরেই আঙ্কেলের ছেলে, আমেরিকাফেরত শিহাবের সাথে আমার বিয়ের বন্দোবস্ত। বিদেশে থেকেও সে এতোটা কুটিল-জটিল রয়ে গেছে, এটা ছিলো আমার কাছে কল্পনাতীত। সেও বাবার সাথে কূট-ষড়যন্ত্রে শামিল হলো।

দ্বিতীয় পর্ব

আমি সেই দুই পরিবারের পুরনো রেষারেষির শিকার। ব্যবসায়িক কোন্দলের খাঁড়ার ঘা আমার ওপর এসে পড়েছে। আমার ওপর কেন এল এই খড়গ? আমি তো কারো ক্ষতি করিনি? কেন আমার ভবিষ্যতটাকে ভেঙে খানখান করে দেয়া হলো? ফুলের মতো নিষ্পাপ একটা জীবনকে ছত্রখান করা হলো?
শুয়ে শুয়েই এসব ভাবছিলাম। বুক চিরে দীর্ঘশ্বাসের মিছিল বের হচ্ছিলো। বাসররাতেই কালো দাগ লেগে গেলো, ভবিষ্যতটা কেমন যাবে? আমার এখন আর কান্না আসছে না। ভেতরে কেমন যেন আগুন জ্বলছিলো। আমি তড়াক করে শোয়া থেকে উঠলাম। আব্বুর সামনে গিয়ে বললাম, আব্বু আপনি কষ্ট পাচ্ছেন কেন, আপনি অনুতপ্ত হওয়ার মতো কিছু করেননি। আমিও এ ধাক্কা সামলে উঠবো।
আব্বু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। তার দু'চোখ ক্রমশ ঝাপসা হয়ে উঠছিলো। আমি দ্রুত আমার কামরায় ফিরে এলাম। আব্বুর ভেঙে পড়ার দৃশ্য দেখার হিম্মত হলো না। আম্মু নির্বাক হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকলেন।
সারাটা দিন ঘরে শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিলাম। আস্তে আস্তে মাথা কাজ করতে শুরু করলো। রাতে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফোনটা হাতে নিলাম। নতুন একটা সিম ঢুকিয়ে নির্দিষ্ট নাম্বারে কল দিলাম। গলার আওয়াজকে যথাসম্ভব নিচু করে কথা শুরু করলাম–
: হ্যালো আমি রাবওয়া বলছি, হিকমাহ আছে?
: না তো, এখানে তো কোনো হিকমাহ থাকে না।
: আপনি হিকমার বড় ভাই না?
: না, আমি তো শিহাব। আমার কোনো বোন নেই।
: দুঃখিত, আমি আপনাকে বিরক্ত করেছি। ভুল নাম্বারে কল চলে গেছে।
: না না, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে। এমন হতেই পারে।
কল শেষ করে মনে হলো আমার শরীর দিয়ে হাজার ভোল্টের বিদ্যুত প্রবাহিত হচ্ছে। ঘৃণায়, রাগে শরীরটা রি রি করতে লাগলো। মোবাইলের ওপর থু থু মেরে বসলাম। এটা দিয়ে সে পাপিষ্ঠ নরাধমের কথা শুনেছি আমি?
কিন্তু নিজেকে প্রবোধ দিলাম। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। রাগলে চলবে না। তাহলে সব ভেস্তে যাবে। ভণ্ডুল হয়ে যাবে। মধ্যখানে একদিন বিরতি দিলাম। পরদিন রাতের বেলায় আবার কল দিলাম–
: হ্যালো হিকমাহ, কাল কলেজে যাবি তো?
: দুঃখিত, আমি শিহাব।
: এই যাহ, আবারও রং নাম্বার। কী হয়েছে, বারবার একই ভুল কেন হচ্ছে?
: ভুল হলে হোক, সমস্যা নেই। হিকমাহ না হলেও কথা বলতে তো বাধা নেই।
সেদিন থেকে শুরু হলো। আমার পরিকল্পনামাফিক ছক এগুতে থাকলো। আমি যা ধারণা করেছিলাম তার চেয়েও দ্রুত সে সাড়া দিতে লাগলো। যেন সে এতোদিন আমার অপেক্ষাতেই ছিলো। আমার প্রতিজ্ঞা দিনদিন কঠোর থেকে কঠোরতর হচ্ছিলো। আমার জীবনটা সে যেমনিভাবে তছনছ করে দিয়েছে, আমিও তাকে একটা তছনছে জীবন উপহার

দেবো। আমাদের কথাবার্তা চলতে লাগলো। শিহাব আমাকে দেখার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলো। আমি কোমলভাবে এড়িয়ে যাচ্ছিলাম।

সে বললো, তোমার মতো এতো ভদ্র, কোমল মানুষ আমি আর দেখিনি। এতো সুন্দর করে কথা বলতে আমেরিকাতেও কাউকে দেখিনি।

আমি ক্রুর হেসে বললাম, শুনেছেন, হয়তো খেয়াল করেননি।

আরও কয়েকদিন পর, সে আমাকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসলো। আমি বিদ্রুপের স্বরে হেসে বললাম, না দেখেই প্রস্তাব দিচ্ছেন?

: তোমাকে দেখার দরকার নেই। কথা শুনেই বুঝতে পারছি, তোমাকে ছাড়া আমার ইহজীবন বৃথা।

: আমি তো এখনই বিয়ের কথা ভাবছি না। আগে লেখাপড়া শেষ করে নিই, তারপর অন্য কিছু।

: কিন্তু আমি তো তোমাকে ভীষণভাবে চাইছি। তুমি আমাকে বাঁচাও।

: আমি কিভাবে বাঁচাবো?

: আমি যখন আমেরিকায় থাকি, তখন থেকেই আমার বিয়ে পারিবারিকভাবেই ঠিক হয়ে ছিল।

: কার সাথে?

: আমার চাচাতো বোন নাজিয়ার সাথে।

: তো বিয়ে করে ফেলছেন না কেন?

: মধ্যখানে অন্য একটা কাজ ছিলো, সেটা সারতে একটু সময় লেগেছে। এখন আর কোনো কাজ নেই। তাই আব্বু আর চাচাজান উঠেপড়ে লেগেছেন। এবার আর ছাড় নেই। কিন্তু আমি তো তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না।

: আচ্ছা, আমার খুব ইচ্ছে করছে আপনার চেহারাটা দেখতে। আপনি অমুক ঠিকানায়, আপনার স্বাক্ষর করা একটা ছবি পাঠাতে পারবেন?

: অবশ্যই পারবো। আমি কালই পাঠাচ্ছি।

পরদিনই আমি নির্দিষ্ট জায়গায় ছবির প্যাকেটটা পেলাম। একটা নয় অনেকগুলো ছবি। সবগুলোর পেছনেই হাবিজাবি লেখা। নানা রঙঢঙের কথা লেখা। আমি মুচকি হেসে সব পার্সে ঢুকিয়ে রাখলাম।

একমাস পরে শিহাব ফোনে জানালো, তার বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। তার এ বিয়েতে মোটেও মত নেই।

: আমার তো বিয়ে ঠেকিয়ে রাখার আর কোনো রাস্তা খোলা নেই। তোমাকে বিয়ের আগে একবার হলেও দেখতে চাই। তুমি কি অন্তত বিয়ের আসরে হলেও হাজির হতে পারবে?

: তুমি কী বলছো! তুমি বিয়ের দিনও আরেকজন বেগানা নারীকে দেখতে চাচ্ছো? তুমি তো সাংঘাতিক মানুষ!

: তুমি আমার সম্পর্কে আর কি-ইবা জান। আমি আরও বড় কিছুও করতে পারি। করেছিও।

: একটু বলো না গো!

: নাহ, থাক সেসব। এখন তুমি বিয়েতে আসবে কি না বলো?

: আমার আসাটা কি ঠিক হবে? তুমি সেদিন তোমার নতুন বউকে নিয়েই থাকবে। সেটাই ভালো।

: না, সেটা মোটেও ভালো হবে না। আমি তাকে একদম পছন্দ করি না।

: কেন, তাকেই তো তোমার পরিবার আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলো। তুমিও তাকে পছন্দ করতে।

: তা হোক, তাকে এখন আর পছন্দ হয় না।

বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলো। আমিও সবকিছু গুছিয়ে রাখলাম। তার পাঠানো ছবিগুলোর আরও কপি করিয়ে রাখলাম। বিয়ের দিন সবাই তখন আসরে উপস্থিত। একটু পরেই আকদ শুরু হবে। আমি গোপনে কয়েকজনকে দিয়ে ঘরে-বাইরে বিভিন্নজনের কাছে ছবিগুলো পাঠালাম। সাথে একটা করে সিডি। আমাদের এতদিনকর কথোপকথনের অডিও।

এরপরের ঘটনাগুলো বেশ দ্রুত ঘটলো। হুলুস্থুল কাণ্ড লেগে গেলা। রীতিমতো মারামারি লাগার মতো অবস্থা। কনেপক্ষ তার আত্মীয় হলেও, বিয়ের মঞ্চেই কনের বড়ভাই, মানে শিহাবের চাচাতো ভাই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো–

: ব্যাটা নিমক হারাম! তোকে আমরা টাকা খরচ করে আমেরিকা থেকে পড়িয়ে আনলাম। আর তুই কিনা এমন দাগা দিলি? আরেক জায়গায় গাদ্দারি করে তোরা পথের ফকির হয়ে রাস্তায় ঘুরঘুর করছিলি, উঠিয়ে এনে উঁচু আসনে বসালাম। আর তুই কিনা এই প্রতিদান দিলি।

দিন গড়িয়ে রাত হলো। আমি সময়মতো ফোন করলাম–

: ওহ রাবওয়া, বাঁচালে! তোমার ফোনের অপেক্ষাতেই এতোক্ষণ বসে ছিলাম।

: কেন? তোমার না আজ বাসররাত?

: না রাবওয়া, আজ অনেক কিছু ঘটে গেছে। তোমাকে পাঠানো ছবিগুলো কিভাবে যেন কনেপক্ষের হাতে পড়েছে। রাবওয়া তুমি ছবিগুলো কি কাউকে দিয়েছিলে?

: আমি রাবওয়া নই।

: তুমি কে?

: আয়েশা!



বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলো। আমিও সবকিছু গুছিয়ে রাখলাম। তার পাঠানো ছবিগুলোর আরও কপি করিয়ে রাখলাম। বিয়ের দিন সবাই তখন আসরে উপস্থিত। একটু পরেই আকদ শুরু হবে। আমি গোপনে কয়েকজনকে দিয়ে ঘরে-বাইরে বিভিন্নজনের কাছে ছবিগুলো পাঠালাম। সাথে একটা করে সিডি। আমাদের এতদিনকর কথোপকথনের অডিও।



সেদিন ভোর চারটে বারো মিনিটে ভয়াবহ শিলাবৃষ্টি হয়েছিলো

সাব্বির জাদিদ

সেই রাতে চাঁদ ছিলো আকাশে। পুবের চাঁদ শেষরাতে হেলে পড়েছিলো পশ্চিমে। নামাজিরা আজানের প্রথম শব্দেই যাদের ঘুম ভেঙে যায় ঘুমের ভেতরেই তারা বিছানায় নড়াচড়া করছিলো। এমন সময় হঠাৎ মেঘ ডেকে ঝড় উঠলো। বাতাসে পাক খেতে লাগলো ধুলো। লম্বা চিকন মেহগনি গাছ বাতাসের সাথে তাল মিলিয়ে দুলতে লাগলো ডানেবায়ে, সামনেপিছে। অল্পক্ষণে বাতাসের সাথে বৃষ্টি নামলো ঝুমঝুম। চরাচরে নেমে এলো শান্তি। পরম আয়েশে ঘুমের ভেতরেই কাথায় টান পড়লো সবার। এই আয়েশের ঘুম স্থায়ী হলো না। হুট করে বৃষ্টি থেমে শিলা পড়তে শুরু করলো। প্রথমে কুচো কুচো নুড়িপাথরের মতো সাইজ। সচারচর যা হয়। একটু পরেই আকার বেড়ে গেলো দুইগুণ- পাঁচগুণ- দশগুণ। আস্ত ইট হাতুড়ি মেরে দুইভাগ করলে যেমন হয়, তেমন শিলা পড়তে লাগলো মাটির পৃথিবীতে, ঘরের চালে, ফসলের ক্ষেতে, গাছের মাথায়। টিনের চালঅলাদের অনুভব– শত্রুপক্ষ পরিকল্পিতভাবে ইট মারছে বাড়ির উপর। ছুটিপুরের সবচে বুড়ো মানুষটির সাক্ষ্য– এমন অদ্ভুত ভয়ঙ্কর সাইজের শিলা তার পঁচাশি বছরের জীবনে এই প্রথম। বাপরে বাপ!

দুই.

আবদুল আজিজের পোষা কুকুরের বাচ্চাটি ঘুমিয়ে ছিলো মকবুলের চায়ের দোকানে কুণ্ডলী পাকিয়ে। বৃষ্টি বাড়লে কুকুরটি ঘুমের ভেতরেই চা-বানানো চুলোর পিঠে গড়া দিয়ে শুলো। চুলোর উত্তাপ আর বৃষ্টির শীতলতায় বেশ আরামের ঘুম হচ্ছে। আরাম বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। টিনের ছাওনীর পাশ দিয়ে বড় বড় শিলাখণ্ড আছড়ে পড়তে লাগলো চুলোর পিঠে। কুকুরছানার ঘুম ভেঙে গেলো। একটু ধাতস্থ হয়ে চারপাশে তাকিয়ে বুঝতে পারলো মকবুলের চায়ের দোকান এখন নিরাপদ নয়। দোকান আর মালিকের বাড়ির মাঝখানে একটা মাত্র রাস্তা। কুকুরছানা রাস্তাটা পার হতে গিয়েই মারা পড়লো। একসাথে দুটো শিলাখণ্ড এসে আছড়ে পড়লো তার গায়ে আর মাথায়। মাথা ঘুরে পড়ে গেলো রাস্তার মাঝখানে। আর উঠতে পারলো না। চারদিকে শিলাবৃষ্টির হিংস্র শব্দের তোড়ে শোনা গেলো না কুকুরছানার শেষ চিৎকার।

তিন.

আক্কাস শেখ ছুটিপুরের সম্ভ্রান্ত চাষি। এইবার পনেরো বিঘা ধান লাগিয়েছে মাঠে। চাষের কাজ নিজে করে না সে। সব বর্গা দেয়া। বর্গাতিরা ফসল কেটে সবকিছু গোছগাছ করে পৌঁছে দেয় শেখের বাড়ির আঙিনায়। সেই ফসল তার সারা বছরের খোরাকি। আক্কাস ঘুমিয়ে ছিলো ছাদঅলা ঘরে। শেষরাতে ছাদের উপর ধুপধাপ-দুমদাম শব্দ হতে লাগলো। কেউ যেন ইট মারছে। শেখের পাতলা ঘুম ভেঙে গেলো সেই শব্দে। জানালা খুলতেই ঠাকশ শব্দে একটা শিলা পড়ল লোহার গ্রিলে। ভয় পেয়ে আক্কাস শেখ জানালার পাল্লায় ধাক্কা মেরে বিছানায় ফিরে এলো। বউয়েরও ঘুম ভেঙে গেছে শিলা আর জানালার পাল্লা বাড়ি খাওয়ার শব্দে।

আব্বাস শেখ আতঙ্কিত গলায় বললো, এ কী হচ্ছে, এমুন শিল পড়া তো জীবনেও দেকিনি! আল্লাহ, মাটের ধান তো সব শ্যাষ, ইবার খাবোনে কী?
বউয়ের মাথায় তখন আম আর লিচু বাগানের চিন্তা– ও আল্লাহ! এমুন শিলি তো বাগানের আম লিচু এট্টাও থাকপিনেনে। আগেই কইছলাম, ইবার এত বইল আসছে আমের, ঝড়উ হবি সেম্মা। এখুন তা-ই হচ্চে। আব্বাস শেখ বলল, বউ, আম লিচু না খায়েও মানুষ বাঁচে। কিন্তু প্যাটা যদি খাত না পড়ে, তালি ক্যাম্মা বাঁচপি মানুষ!

চার.
আলী বকশ বংশপরম্পরায় ঝাড়ফুঁকের ঐতিহ্য বহন করে আসছে। কারো কোমরে ব্যথা হলো, তো ছোট আলী বকশের কাছে। পাতলা পায়খানা হচ্ছে কারো বা রাতে তালগাছের মাথা দেখে ভয় পেয়েছে কেউ, যাও আলী বকশের কাছে। তার এক ফুঁ-তে রোগবালাই দেশছাড়া! জনশ্রুতি আছে এই আলী বকশের পরদাদা আজান দিয়ে শিলাবৃষ্টি বন্ধ করতে পারতো। তো এই রাতে যখন আলী বকশের টিনের চাল ভেঙে পড়ার উপক্রম, সে দাঁড়িয়ে কানে আঙুল দিয়ে উচ্চস্বরে আজান দিতে লাগলো। তার ধারণা ঝাড়ফুঁকের মতো শিলাবৃষ্টি বন্ধের ক্ষমতাও সে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে। সে একবার নয়, তিনবার আজান দিলো। কিন্তু শিলাবৃষ্টি থামলো না।

পাঁচ.
রতন কলেজে দর্শনের উপর অনার্স করছে। নামাজ-কালাম আল্লাহ-খোদার ধার ধারে না। এমনকি কখনো ঈদের জামাতেও দেখা যায় না তাকে। প্রায়ই সে ধার্মিক মানুষের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়ে। তার মতে ধর্মকর্মের নামে যা করা হয়, তা সময় নষ্ট ছাড়া কিছু নয়। এই সময়টা জ্ঞানচর্চায় ব্যয় করলে জীবনের মান আরো উন্নত করা সম্ভব। শিলাবৃষ্টির রাতে রতনের টিনের চালে ধুমধাম-ধড়ধড় শব্দ হতে লাগলো। টিন ভেঙে পড়ো পড়ো অবস্থা। রতন বিছানা ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। বুঝতে পারছে না সে কী করবে। অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকলো চালের দিকে মুখ করে। তার মনে হচ্ছে এক্ষুণি টিন ভেঙে বড় বড় বরফ তার মাথায় পড়বে। কখন যে সে এই দুর্যোগ থেকে মুক্তি পেতে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা শুরু করেছে নিজেও টের পায়নি। শিলাবৃষ্টি থামলে ভোরে সে গ্রামের অবস্থা দেখতে রাস্তায় নামলো। তরফের



বাঁশঝাড়ে গিয়ে দেখলো শতশত শালিক পাখি মরে পড়ে আছে শিলার আঘাতে। কিছু কিছু তখনো জীবিত। তীব্র যন্ত্রণায় চিঁচিঁ করে ডাকছে আর অল্প অল্প নড়ছে। রতন ভাবলো, নাহ! করুণাময় বলে কিছু নেই। থাকলে এই নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা তার দ্বারা সম্ভব হতো না।

ছয়.
নিয়ামতের টিনের চাল পুরনো আর দুর্বল। বড় বড় শিলা সেই টিনে পড়তেই ঠাশঠাশ করে ফেটে গেল টিন। ছোট্ট একটা মেয়ে আর বউ নিয়ে নিয়ামতের সংসার। সে পরিবার নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলো। হঠাৎই শরীরে শক্ত পাথর পড়ার অনুভূতি হলো। নিয়ামতের মেয়ে পিঙ্কি চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। হতবুদ্ধি নিয়ামতের ঘটনা বুঝতে সময় লাগলো কিছুক্ষণ। এমন ঘটনা জীবনে এই প্রথম। নিয়ামত তড়িঘড়ি পিঙ্কিকে কাথা দিয়ে মুড়িয়ে বউসমেত চোকির নিচে ঢুকিয়ে দিলো শিলার আঘাত ঠ্যাকাতে। শিলা ততক্ষণে থেমে নেই। টিন ছিদ্র হয়ে মাঝে মাঝেই নিয়ামতের পিঠে পড়ছে। ছোট চৌকির তলা বউ আর মেয়েতে পূর্ণ হয়ে গেছে। নিয়ামত এখন যায় কোথায়! সে কাঠের ভারি চেয়ার উপুড় করে মাথায় নিয়ে মাটিতে বসে আল্লাহ আল্লাহ করতে লাগলো। কাঠের উপর ঠকঠক করে পড়তে লাগলো শাদা ঠাণ্ডা বরফ। নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পরেই নিয়ামতের মনে পড়লো দশ কাঠা ভুঁই গমের কথা। এই বিশাল বিশাল শিলার সামনে টিঙটিঙে গমের ডাঁট দাঁড়িয়ে থাকার কথা না। মেয়েটা কাঁদছে। কিন্তু মাঠে বিধ্বস্ত গমের কান্নাই বুকে বড় বাজতে লাগলো নেয়ামতের।

সাত.
হারেস এবার পনের কাঠা কলা লাগিয়েছে। চাপা কলা। বড় বড় কাঁদি পড়েছে। কলা ফুলতে শুরু করেছে। কলা বেচা টাকায় সমিতির লোন শোধ করতে হবে। ইদানীং চোরের উৎপাত বেড়েছে। কয়েকদিন আগে পাঁচ কাঁদি কলা চুরি হয়েছে। হারেস তাই রাত জেগে মাঠ পাহারা দেয়। এই রাত এগারোটা বারোটা পর্যন্ত মাঠে থাকে। তারপর বাড়ি এসে একটু ঘুমিয়ে চারটের দিকে আবার যায়। আজও গেল। মাঠে ঢোকার পরেই বাতাস পাক খেতে শুরু করলো। পাকানো বাতাসের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা হারেসের আছে। সে মাঠের মানুষ। ঝড়বৃষ্টির ভেতরেই তার নিত্য জীবনযাপন। হারেস জোর পায়ে কলার ভুঁইয়ের দিকে হাঁটতে লাগলো।
কিছুদূর যাওয়ার পরেই বৃষ্টি নামলো এবং অল্পক্ষণে বৃষ্টি পুরোপুরি থেমে গিয়ে বড় বড় শিলা পড়তে লাগলো। হারেসের এবার ভয় ধরে গেলো। এতবড় শিলা সে বাপের জনমে দেখেনি। সে তাড়াতাড়ি একটা বাবলাগাছের গোড়ায় আশ্রয় নিলো। কিন্তু বাবলাগাছ হারেসের নিরাপত্তা দিতে পারলো না। শিলার আঘাতে বাবলার ছোট ছোট ডাল ভাঙতে লাগলো। ভয় পেয়ে হারেস বাড়ির পথে দৌড় শুরু করলো। কিন্তু বাড়ি বহুত দূর। আধলা ইটের মত একেকটা শিলা হারেসের গায়ে-মাথায় আঘাত করতে লাগলো। হারেস মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। সারা গায়ে মাথায় তীব্র যন্ত্রণা।

হারেস জোরে জোরে আল্লাহ বাঁচাও আল্লাহ বাঁচাও বলতে লাগল। সে চিৎকার করে, তার মাথায় শিলা পড়ে। সে চিৎকার করে, ঘাড়ে শিলা পড়ে। সে চিৎকার করে, তার নাকে শিলা পড়ে। এক সময় তার মাথা ফেটে যায়, গা থেঁতলে যায়, চোখ গেলে যায়। তার উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা হয় না। এবং অল্পক্ষণে তার শরীরের উপর শাদা বরফের আস্তর পড়ে যায়। সেখানে জীবিত হারেসের কোনো চিহ্ন থাকে না। সেই জায়গাটা কবরের পিঠের মত উঁচু মনে হয়।

আট.

তোফায়েল সাহেব গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাতে গ্রামে এসেছেন। সঙ্গে সুন্দরী স্ত্রী। গ্রামে তার ছোটভাইয়ের দৃষ্টিনন্দন মজবুত দোতলা বাড়ি। ছুটিছাটা পেলে প্রায়ই গ্রামের এই বাড়িতে আসেন। সেইরাতে তোফায়েল সাহেব ঘুমিয়ে ছিলেন দক্ষিণমুখী জানালা খুলে। ঢাকায় এসির ভেতর তার বসবাস। গ্রামের লোডশেডিং বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে। শেষরাতে ধূলিযুক্ত দমকা হাওয়া জানলা দিয়ে ঢুকে ঘুম ভেঙে দিলো তোফায়েল সাহেবের। বিরক্ত হয়ে তিনি জানালার কাচ টেনে দিলেন। তলপেটে চাপ অনুভব করায় বাথরুমে ঢুকলেন। ফ্রেশ হয়ে বের হয়ে খেয়াল করলেন ছাদের উপর ইট পড়ার ধুপধাপ শব্দ। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। এমন ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি এই বাংলাদেশে হচ্ছে তিনি ব্যাপারটা খুব উপভোগ করতে লাগলেন। বাড়ির সামনের লনে একহাঁটু শাদা বরফ জমে আছে। স্তূপ ক্রমেই উঁচু হচ্ছে। এ যেন বাংলাদেশ নয়, তুষারঢাকা উন্নত কোন দেশের ছবি। তিনি তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে ডেকে তুললেন। সেলিনাও এই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে বললেন, এইবার গ্রামে আসাটা সার্থক হলো। অতঃপর তাদের একমাত্র মেয়ে এলিনার জন্য দুজনই খুব আফসোস করতে লাগলেন। এলিনা জিদ ধরে ঢাকায় রয়ে গেছে। গ্রামে আসলে এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য উপভোগকারীদের একজন এলিনাও হতে পারতো। এমন সুযোগ তো সবসময় আসে না!



মেঘে ঢাকা রোদ্দুর তুমি

মুনশি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

সন্ধ্যা তখন নেমে এসেছিলো দিগন্তজুড়ে। আমি আর তুমি হাঁটছিলাম একমনে। চারপাশটা আঁধারে নিকষ কালো হয়ে আসছিলো ধীরে ধীরে। তবু তোমার ভয় ছিলো না বুকে। দুরুদুরু কাঁপছিলোও না ক্ষণিকের জন্য। কারণ তোমার হাতটি ধরেছিলাম হতভাগা তোমার এই সন্তান। মা! খুব ভালোবাসতাম তোমায়। বুঝতে দিইনি কখনও। পারিনি বোঝাতে। হাতটি ছেড়ে হঠাৎ আমিই অভিমান করে বসেছিলাম তোমার ওপর–'এবার যাও তো দেখি! চলো তো পথ একলা!' মান ভাঙাতে শুরু করেছিলে তুমি। পিচঢালা পথে লেপ্টে থাকা তোমার পদছাপ আজও আমায় মনে করিয়ে দেয় সেই সোনালি স্মৃতি। গেঁথে আছে হৃদয়গহীনে। বারবার কাঁদায়। ভাবায় সেই পেছন-কথা। তোমার জন্য মায়াবী একটুকরো রক্তপিণ্ড জমে আছে বুকের পাজরে। না বলা আর্তনাদ ভেতরটাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়, খাচ্ছে। ভেবেছিলাম–ক্ষমা চাইবো, ভুল হয়ে গেছে বলে স্যরি বলবো। কিন্তু সে সুযোগটুকুও দিলে না। এর আগেই চলে গেলে দূর একাকিয়া শূন্যের পথে। বনে গেলে অশরীরী। পথটি ধরে তোমার চেয়ে রইলাম অপলক; তুমি আসবে বলে।

ছেলেবেলায় হারিয়েছিলাম বাবাকে। আদর-স্নেহ পাইনি তেমনটা। যতটুকু, তাও তোমার ওই মায়াবী কোলে। এই স্বার্থপর নগরীর অলিগলিতে খুঁজে মরি আজও তোমার স্নেহ, একটু সুখের তরে। মেলে না দেখা। খানিকটাও মেলে না মা! তোমার ওই স্নেহমাখা মুখখানিই মনে পড়ে বারবার। তোমার চলন-বলন আমায় শেখায় অকৃত্রিম ভালোবাসা। ভালোবাসি তাই তোমাকেই কেবল।

মাগো! একটুআধটু যখন বুঝতে শুরু করলাম, তখন অসময়ের ঘাড়ে চেপে হাজির হলাম তোমার দরবারে। ছিলো না তোমার দেখা। করো না মাফ আমায়। আমি তো তোমারই সোহাগের সন্তান। যে তোমায় বড় বেশি ভালোবাসি। সেই তো হয়েছিলো তোমার সঙ্গে আমার খুনসুটি। মেলেনি আর শান্তি-প্রশান্তি মনেপ্রাণে। পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে তোমার স্নেহ-ভালোবাসা মাগো! এ যে অফুরান। ভালোবাসার বিরান পাতায় আছড়ে পড়বে এসব প্রেম সজীবতায়। অতীতের জানালা আরও স্বচ্ছ হতো, যদি জানতে! বুঝতে যদি তুমি! কিন্তু না, বুঝলে না মা আমায়। ছেড়ে চলে গেলে দূর দেশে। না ফেরা দিগন্তে বাড়ালে পা। ভাসালে আমায় বিচ্ছেদ-বিরহে।

ফেরারী সেই পথ মাড়িয়ে মিশে গেলে দূর অমানিশায়। একা পথিক আমি পথের মাঝেই মিলিয়ে যেতে লাগলাম। ভেতরটা তখন আঁৎকে ওঠলো অজানা শঙ্কায়–কিচ্ছু হবে না তো তোমার! তোমায় ছাড়া ছন্নছাড়া এ জীবন যে বড় অচল।

দূর আকাশের নীলিমা আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছিলো, পাশের নদীর জল উপচে পড়ে কিছু একটা চাইছিলো বলতে, আশপাশের পাহাড়-চূড়াসম গাছগাছালি ক্ষণে ক্ষণেই বেজায় উত্যক্ত করছিলো। বুঝতে পারছিলাম না–এ আমার বড় বেয়াদবি হয়েছিলো তোমার সঙ্গে। একটা কিছুর আবদার করা নিয়েই করেছিলাম অভিমানটুকু। বদলে তার এতো বড় শাস্তি! ভাবতেও পারিনি। তোমার সাধ্য ছিলো না বাড়তি বিলাসিতার। তাইতো ঘটেছিলো এমন কাণ্ডখানা।

মা, আজ আমি এই শহরে একলা সন্ধ্যে গড়াই। সাঁঝের পাখপাখালিরা এখানে আর নেই। নদীর স্বচ্ছজলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করে উঁকিঝুঁকি মারার শব্দও ভাসে না কানে। আকাশের নীলিমারাও বড্ড ভুলে বসেছে আমায়। ডাকে না আর হাতছানি দিয়ে। তবে অজস্র লোক আছে চারপাশে। দুঃখস্রোতে কাটাই বা কাটাই না তাদের সঙ্গে দিনরাত। কিন্তু ওই একটা আবদার আজও ভুলিনি। মনে পড়ে কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে। তোমার সঙ্গে করা সেই বেয়াদবিটুকুও গেঁথে আছে স্মৃতির পাতায়। দিন তিনেক পরে পেয়েছিলাম তার উপযুক্ত শাস্তি। মা, আমার দুঃখে তুমি বেশ দুঃখিত হয়েছিলে। কেঁদেছিলে আমায় জড়িয়ে। চোখের জলে আমার মুখ, চিবুক, এমনকি সারা দেহ ভাসিয়ে দিয়েছিলে। মাগো! আমার জন্য দরদে উতলে ওঠা তোমার সেই কান্নারা আজ কোথায়! ভালোবাসার মায়াজালে পড়ে আজও আমার আপদে-বিপদে কি খুঁজে বেড়ায় না আমায়!

আমার এ্যাকসিডেন্টের পর তোমার সেই আহাজারি আজ আর শুনি না। তোমার সেই আকুতি আমার যে বড় ভালো লাগে। সন্তানের জন্য কতটা মায়া থাকে মায়ের, টের পেয়েছিলাম সেদিনটাতেই। সত্যিই মা তোমার নেই কোনো তুলনা। তুমি পৃথিবীর অনন্যা। এই জগৎসংসারের মিথ্যে ধোঁয়াশায় ভরা কৃত্রিম আদর-স্নেহ, আর দরদে আজ উপচে পড়ছে আশপাশ। বেশ পাচ্ছিও এখানে। কিন্তু আমার প্রতি তোমার সেই মায়াবী অশ্রু ছিলো কেবল সত্যিকারের। এর কোনো উপমা হয় না। আকাশের গায়ে স্নেহের লালচে রোদ্দুর মেখে হৃদয় ছুঁয়েছিলে তুমি। বেদনার লাল-নীল রঙের অতলে হারিয়ে ফিরে পাওয়া অনন্যা তুমি। হৃদয়াকাশে জড়ো হওয়া একখণ্ড অকৃত্রিম ভালোবাসার মেঘ, মেঘে ঢাকা রোদ্দুর তুমি। তুমি একলা জীবনের উত্তম সঙ্গী। তোমায় হারিয়ে তোমার বিরহে আজ আমি যেনো আমি নেই, অন্য কেউ কিংবা সর্বহারা। বনে গেছি যেনো পাথর। তোমার স্নেহ কেবল শিখিয়েছে আমায় সত্যিকারের স্নেহ-ভালোবাসা।

সেই থেকে আজ অবধি পায়ে চলা পথ আমার তোমায় ঘিরে। কাঁদি। নির্ঘুম রাত পার করি। নির্জনে একলা মনে বসে থাকি। জগতের সব উপেক্ষা করি। মৃদুমন্দ প্রশান্তির মিথ্যে আশায় কোলাহলে জড়িয়ে পড়ি। হারিয়ে যাই ভাবনায়, তোমার স্নেহ-মায়ার অতীত স্মৃতিলোকে। দিগন্তের পথ পাড়ি দিয়ে যেনো বনে যাই সূচিময় শুদ্ধ মানুষ। এমন ভাবনায় কত পথ হেঁটেছি! হারিয়েছি কতটা দিনক্ষণ বেদনাস্রোতে! তবু তোমায় খুঁজে ফেরার ব্যর্থ চেষ্টা আজও আমার। মা, স্নেহের হাতখানি কি ফের ছুঁয়ে দেবে না তোমার এই খোকার কপোলজুড়ে!

কুইজ প্রতিযোগিতা

১. রাসুল মোহাম্মদ সা.-এর দাদীর নাম কী? ______________________

২. বদর যুদ্ধ কোন মাসে সংঘটিত হয়? ______________________

৩. শেখ সাদি রহ. কোন শহরে জন্মগ্রহণ করেন? ______________________

৪. ইস্তাম্বুল কোন দেশের রাজধানী? ______________________

৫. বাংলার শেষ নবাব কে ছিলেন? ______________________

নিয়মাবলি :

ক. ২০ আগস্ট ২০১৫-এর মধ্যে উত্তর পাঠাতে হবে। খ. কুইজের ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়।
গ. শুধুমাত্র পত্রিকার এই নির্দিষ্ট কুপনে উত্তর লিখে কেটে পাঠাতে হবে।
ঘ. সঠিক উত্তরদাতা ৩ জনের জন্য রয়েছে মূল্যবান বই।

নাম : ______________ পিতার নাম : ______________
গ্রাম : ______________ পোস্ট : ______________
থানা : ______________ জেলা : ______________
মোবাইল নং : ______________

৪র্থ পৃষ্ঠার পর; তাফসির

তোমরাও দু'টি কাজ করো : আল্লাহ তায়ালা এ ঘটনা বর্ণনা করে আমাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরাও যদি কখনো এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হও, তোমাদেরকেও কখনো যদি গুনাহের দিকে প্ররোচিত করা হয়, সিরাতে মুস্তাকিম থেকে সরানোর চেষ্টা করা হয়, তখন তোমরা দু'টি কাজ করবে। প্রথমত এই প্রতিজ্ঞা করবে যে, কোনো অবস্থাতেই আমি সিরাতে মুস্তাকিম হতে বিচ্যুত হবো না। দ্বিতীয়ত তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করো।

এরপর যখন আল্লাহকে ডাকবে, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবেন। অবশ্যই সিরাতে মুস্তাকিমে পৌঁছে দিবেন। মাওলানা রুমি রহমাতুল্লাহি আলাইহি হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের এ ঘটনা সম্পর্কে বলেন–

گر چه رخنه نیست عالم را پدید
خیره یوسف وارمی باید دوید

চারিদিকে পাপ-পঙ্কিলতার লেলিহান অগ্নিশিখা। কুফুর শিরক এবং নাফরমানির ঘোর অন্ধকার। তোমাদের চারিপাশে মুক্তির কোনো পথ নেই। তাই বলে নিরাশ হয়ে পড়ে থেকো না। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মত দরজা পর্যন্ত তোমরাও দৌড়াও। সাধ্যানুযায়ী আপ্রাণ চেষ্টা করে যাও। আল্লাহকে ডাকো, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করো। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে অবশ্যই মুক্তি দিবেন।

এ আয়াতের শিক্ষা : এ আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, দেখুন, সুরা ফাতিহায় আমরা সবাই এই দোয়া পড়ি। আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজেই শুধু নয় বরং প্রত্যেক নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহা পড়া আবশ্যক করে দিয়েছেন। আর اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ সুরা ফাতিহার আবশ্যকীয় একটা অংশ। এর অর্থ আল্লাহ তায়ালা চাচ্ছেন আমার বান্দারা সবসময় আমার দ্বারস্থ হোক। আমার নিকট সিরাতে মুস্তাকিম প্রার্থনা করুক। এজন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রত্যেক রাকাতে আল্লাহ তায়ালা আমাদের দিয়ে এই বাক্যমালা বলাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো প্রত্যেক নামাজের প্রত্যেক রাকাতে আমরা আয়াতটি পড়লেও গতানুগতিকভাবে পড়ি। উদাসভাবে পড়ি। কী পড়লাম, অনেক সময় সেই খবরও থাকে না। ফলশ্রুতিতে এই দোয়ার স্বাদ ও সুফল আমাদের জীবনে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশ পায় না। আয়াতটি যদি আমরা ভেবে-চিন্তে পড়ি, মনোযোগ দিয়ে পড়ি এবং আল্লাহর নিকট মনেপ্রাণে প্রার্থনা করি– 'হে আল্লাহ! আপনি আমার হাত ধরে আমাকে সিরাতে মুস্তাকিমে পৌঁছে দিন। আমরা যদি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে মনোযোগ সহকারে আল্লাহর নিকট চাই, তিনি কি আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন? আমাদেরকে কি ফেলে দিবেন? আমাদেরকে কি শয়তানের হাতে ছেড়ে দিবেন? কখনোই না। আল্লাহ তায়ালা অবশ্য অবশ্যই আমাদেরকে সাহায্য করবেন ও কাছে টেনে নিবেন। শয়তানের কবল থেকে আমাদেরকে হেফাজত করবেন। সারকথা হলো, আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত দ্বারা আমাদেরকে এ শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তোমরা সবসময় আল্লাহর নিকট সিরাতে মুস্তাকিম প্রার্থনা করো। আল্লাহকে বলো, হে আল্লাহ! আপনি নিজে আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমে পৌঁছে দিন। হাত ধরে আমাদেরকে সরল পথে দাঁড় করিয়ে দিন। তাই যখনই নামাজ পড়বেন, মনোযোগ সহকারে এই দোয়া পড়ুন। মিনতিভরে আল্লাহর নিকট সিরাতে মুস্তাকিম প্রার্থনা করুন।

এর পূর্বে দু'টি কাজ করতে হবে : কিন্তু এর পূর্বে দু'টি কাজ করতে হবে। প্রথমত মনে মনে এ ইচ্ছা করতে হবে যে, আমি সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর নিকট সিরাতে মুস্তাকিম প্রার্থনা করছি। এর সাথে সাথে অন্তরে আমলের জন্য আগ্রহ পয়দা করতে হবে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। দ্বিতীয়ত নিজেদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করতে হবে। তাহলে আপনার এই দোয়া অবশ্যই কবুল হবে।

কিন্তু কারো অন্তরে যদি নিয়ত না থাকে, ইচ্ছা-আগ্রহ এবং কামনা না থাকে, আমলের মধ্যেও যদি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা না থাকে, তবে আপনার উদ্দেশ্য কিভাবে সফল হতে পারে? এর অর্থ তো এই, যাচ্ছেন এক পথে আর চাচ্ছেন অন্য কিছু। কারো গন্তব্য যদি হয় পশ্চিমে, আর সে যদি যেতে থাকে পূর্বে, আর আল্লাহর নিকট যদি দোয়া করতে থাকে, হে আল্লাহ আমাকে পশ্চিমে পৌঁছে দিন। সে কি কখনো তার গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে? এটা আল্লাহর নিকট দোয়া করা হবে না বরং আল্লাহর সাথে ঠাট্টা করা হবে।

মনের মধ্যে পাক্কা নিয়ত পূর্বদিকে যাওয়ার, চলছেনও পূর্বদিকে। আর মুখে বলছেন, হে আল্লাহ! আমাকে পশ্চিমে পৌঁছে দিন। এটা দোয়া নয়, আল্লাহর সাথে ঠাট্টা করা, মশকরা করা।

এটা আল্লাহর সাথে ঠাট্টা করার নামান্তর : মনে করুন, কারো দীনের উপর চলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। বরং মনেপ্রাণে ইংরেজ হওয়ার খায়েশ। মনের ভেতর পশ্চিমাদের মত জীবন যাপনের ইচ্ছা। তাই সে সারাদিন তাদের মতই চলার কসরত করে। এরপর যদি সে আল্লাহকে বলে, হে আল্লাহ! আমাকে সিরাতে মুস্তাকিম দান করুন। এটা দোয়া করা হবে না, আল্লাহর সাথে মশকরা করা হবে।

হ্যাঁ, কারো অন্তরে যদি দীনের উপর চলার দৃঢ় ইচ্ছা থাকে, সে যদি সত্যিকার অর্থেই এ কথা মনে করে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের বাতানো পথেই আমার দুনিয়া আখেরাতের কামিয়াবী। আমি সে অনুযায়ী চলছি, সেভাবে অগ্রসর হচ্ছি। এরপরও যখন কোনো সমস্যা দেখা দেয়, কোনো বিপদ আসে, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে– 'হে আল্লাহ! আমার সব সমস্যা ও সঙ্কট দূর করে দিন।' তখন অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য আসবে। জীবনে বিপ্লব ঘটে যাবে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে নিয়মিত এই দোয়া করার এবং সঠিক পদ্ধতিতে প্রার্থনা করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ঘর সংসার



স্বামীকে ভালোবাসুন, এভাবে

হুমায়রা মীম

শিরোনাম দেখে অনেকে হয়তো লেখাটা পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। অনেকে ভাবছেন, এটা কি লেখার বিষয় হলো নাকি! সব নারীই তো স্বামীকে ভালোবাসে। হ্যাঁ, ভালোবাসে ঠিকই, কিন্তু অনেক সময় ভালোবাসা প্রকাশ না হওয়াতে সম্পর্কের মাঝে বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ স্বামীকে প্রচণ্ড ভালোবাসেন কিন্তু ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যম কী, সেটা খুঁজে পান না।

একটু ভাবুন, আপনি যেভাবে স্বামীর হৃদয় ও মন উজাড় করা ভালোবাসা চান, তাকে একমাত্র আপনার জন্য নিবেদিত পেতে চান; স্বামীও চায় আপনার একটু হাসি, প্রফুল্ল চেহারা, মোলায়েম কথাবার্তা। আপনার মিষ্টি হাসি, কোমল আচরণ পরিশ্রান্ত স্বামীর পাহাড়সম বিষণ্নতা দূর করে দেয়। শরীর ও মনে তৈরি করে দেয় সতেজতা, উদ্যমতা, কর্মতৎপরতা। ঘরে এসে স্বামী যদি আপনাকে প্রফুল্ল পায় তার আচরণ, কথাবার্তা ও যৎসামান্য উপকরণেও সন্তুষ্ট পায় তাহলে সে রাজ্যজয়ের আনন্দে মেতে উঠে।

এ কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুনিয়াতে সর্বোৎকৃষ্ট নেয়ামত হলো সতী নারী, যে নারীর দিকে তাকালে মন আনন্দিত হয়, যে নারী নিজের সতিত্বকে হেফাজত করে এবং স্বামীর অবর্তমানে তার সম্পদ ও সন্তানাদি রক্ষণাবেক্ষণ করে।

স্বামীকে ভালোবাসার অন্যতম মাধ্যম হলো তাকে সালাম দেয়া। হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা না থাকলে প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে বলে দেবো কোন কাজটি করলে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, অবশ্যই! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পরস্পর বেশি বেশি সালাম প্রদান করো।

স্বামীকে ভালোবাসার আরেকটি উপায় হল আপনজনের কাছে তার প্রশংসা করা। তার ভালো গুণগুলো উল্লেখ করা। হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার স্বামীর প্রশংসা করে কবিতা আবৃত্তি করেছেন- লানা শামসুন ওয়ালিল আফা কি শামসুন/ ওয়া শামসি আফজালু মিন শামসিস সামায়ি/ ফাইন্নাশ শামসা তাতলুয়ু বাদাল ফাজরি/ ওয়া শামসি তাতলুয়ু বাদাল ঈশায়ি। অর্থ– আমার একটি সূর্য আছে আসমানেরও একটি সূর্য আছে, আমার সূর্য আসমানের সূর্যের চেয়ে উত্তম। কারণ আসমানের সূর্য উদিত হয় ফজরের পরে আর আমার সূর্য উদিত হয় এশার পরে।

স্বামী বাড়িতে আসার পূর্বে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা গ্রহণ করুন। কাপড় চোপড় পরিষ্কার রাখুন। স্বামীর সামনে সাজ সজ্জা করুন। মেহেদি ব্যবহার করুন। মেহেদি লাগানো রাঙাহাত স্বামীদের অনেক প্রিয়। তাছাড়া এর দ্বারা বড় একটা সুন্নতও আদায় হবে। শুধুমাত্র স্বামীর উদ্দেশে সুগন্ধি ব্যবহার করুন। আপনার শরীর, স্বর ও শরীরের ঘ্রাণ সবকিছুর মালিক একমাত্র স্বামী। স্বামীকে ছাড়া অন্য কারো জন্য এগুলো প্রকাশ করা যাবে না।

স্বামী বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে সালাম দিয়ে মুচকি হেসে কোমল নজর বুলিয়ে তার হাত থেকে ব্যাগ বা সামানা নিজের হাতে তুলে নিন। শরীরের ঘাম মুছে দিন। বিদ্যুৎ না থাকলে হাতপাখায় বাতাস করুন। পাশে বসে কুশল বিনিময় করুন। প্রথমে নিজের কোনো প্রয়োজন উঠাবেন না। স্বামীকে হাসি-খুশি রেখে তার থেকে কিছু শোনার চেষ্টা করুন। দুঃখের কোনো বিষয় শুনলে সমবেদনা প্রকাশ করুন, খুশির কোনো বিষয় হলে স্বামীকে আরো উৎসাহিত করুন। চলাফেরা কথাবার্তা সবকিছুতে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাভাব প্রকাশ করুন। মনে রাখবেন, স্বামীর ব্যাপারে হাদিস শরিফে এসেছে, যদি নারীদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে সেজদার হুকুম দেওয়া হতো, তাহলে তাকে স্বামীর পায়ে সেজদার হুকুম দেওয়া হতো। একটু চিন্তা করুন! স্বামী কতোটুকু মর্যাদার অধিকারী হলে সেজদার মতো শ্রদ্ধা প্রকাশের

সর্বোচ্চ মাধ্যমের কথা বলা যেতে পারে! স্বামীর সামর্থ্যানুযায়ী নিজের প্রয়োজন তুলে ধরুন। যে জিনিস ক্রয় করার সামর্থ্য নেই সেটা ক্রয় করে দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না। আপনার চাহিদানুযায়ী সিল্ক, কাতান, জামদানি, সাক্কালি ড্রেস কিনে দিতে ব্যর্থ হলে আপনি মন খারাপ করবেন না। বিরক্তি ভাবও প্রকাশ করবেন না। স্বামীর ক্রয় করা যে কোনো পোশাক সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে তৃপ্তির ভাব প্রকাশ করুন। অল্পতেই তুষ্ট থাকুন। মনে রাখবেন, অল্পেতুষ্টি জান্নাতিদের সিফাত।

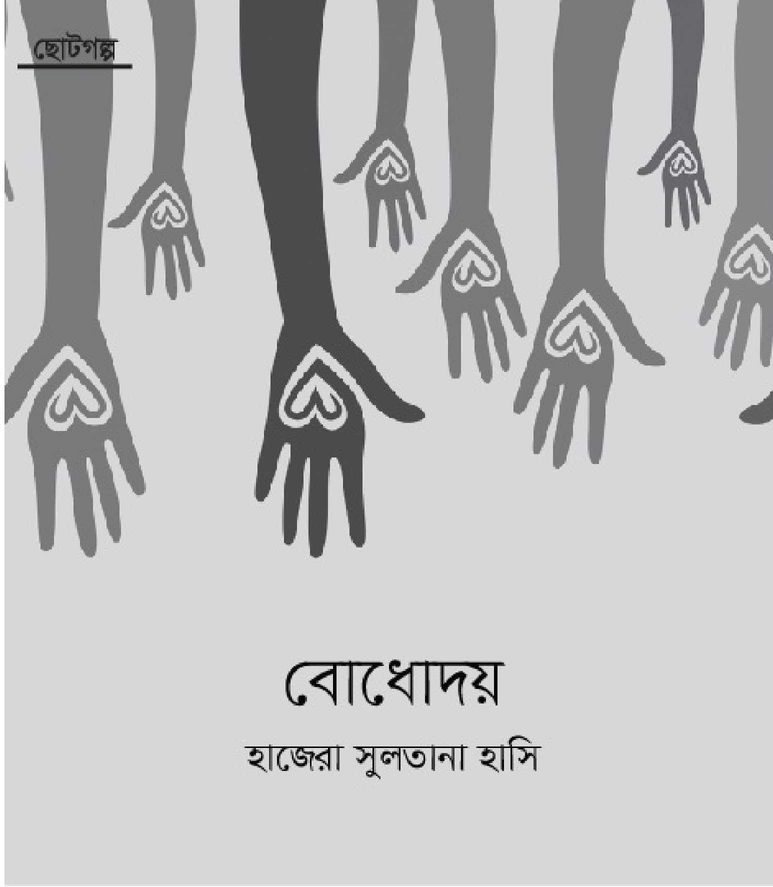
স্বামীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের উদ্দেশে গোনাহের হুকুম ছাড়া তার যে কোনো কথা শ্রদ্ধার সাথে মেনে নিন। হাদিস শরিফে এসেছে, স্বামী যদি এক পাহাড়কে অন্য পাহাড়ের স্থানে স্থানান্তরের হুকুম করে, স্ত্রীর জন্য আবশ্যক হবে সেই হুকুম পালন করা। স্বামীর নিজের, সন্তানাদি, পরিবারের অথবা বাবা মায়ের খেদমত করাকে স্বামীর সন্তুষ্টির উপায় মনে করুন। মনেপ্রাণে সর্বদা স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করুন। যে নারী স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিজি, মুসতাদরাকে হাকিম ৭৪৭৬)

স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার সবচেয়ে বড় উপায় হলো স্বামীর অপছন্দনীয় কাজ, কথা ও আচরণ থেকে বিরত থাকা। স্বামী চাইলেও গোনাহের কোনো কাজের মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করা যাবে না।

মনের মানুষ জীবনসঙ্গী স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখুন। কোনো কারণে তিনি যদি রেগে যান তাহলে নীরবতা অবলম্বন করুন। দেখবেন, পরে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে আপনার হাত ধরে ক্ষমা চাচ্ছেন। কখনো যদি ঘুমের পূর্বে মনোমালিন্য হয় তাহলে স্বামীর বিছানা কিছুতেই ত্যাগ করবেন না। স্বামীর হাতে হাত রেখে বলুন, প্রিয়তম! আমি ততোক্ষন পর্যন্ত ঘুমাবো না যতোক্ষণ পর্যন্ত না আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন। (বায়হাকি, শুআবুল ঈমান ৮৭৩২) মনে রাখবেন, এটি জান্নাতি রমণীদের বৈশিষ্ট্য।

স্বামীর সামনে অন্য কোনো পুরুষ বা নারীর প্রশংসা করবেন না। স্বামীর অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সাথে কথা বলবেন না। দোকানপাট, মার্কেট, আত্মীয়ের বাড়ী এমনকি বাপের বাড়িও স্বামীর অনুমতি ছাড়া যাবেন না। যে কোনো জায়গায় যেতে হলে পর্দার সাথে যান। পর্দা নারীর সতীত্ব হেফাজত করার জন্য খোদায়ি রক্ষাকবচ। নিজকে যতো বেশি হেফাজত করবেন স্বামীর ততো বেশি ভালোবাসা পাবেন।

স্বামীকে মনভরে ভালোবাসুন। কারণ আপনি তার হৃদয়ের সম্রাজ্ঞী, তার স্বপ্নের রাজকন্যা। সে সব নারীকে ছেড়ে আপনাকেই দেহ-মনে স্থান দিয়েছে। আপনি তার রাণী আর তিনি আপনার মুহাফিজ, প্রয়োজনে আপনাকে হেফাজত করতে নিজের প্রিয় জীবনটাকেও দিয়ে দেবেন। তাই সব পুরুষকে ভুলে শুধু তাকে দেহ মনে স্থান দিন। তাকেই ভালোবাসুন।



ছোটগল্প

বোধোদয়

হাজেরা সুলতানা হাসি

তারান্নুম গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর সবচে প্রিয় মামা আজ ওদের বাসায় আসছেন। সেই কখন থেকে পথপানে চেয়ে আছে তারান্নুম। ওর আর তর সইছে না। একটু আগে ওর মামা কল দিয়ে বলেছেন, সামনে চলে এসেছেন আর বেশি সময় লাগবে না। তাই তারান্নুমের কাছে এখন এক মিনিটকেও লাগছে যেনো এক ঘণ্টা। তারান্নুম ছুটে এলো ওর মায়ের রুমে। এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, মামনি, মামাকে কল দাও তো আরেকবার। মিসেস হক একটি বই পড়ছিলেন। বই থেকে মুখ উঠিয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন এবং বললেন, এইমাত্র তোমার মামা কল দিয়েছিলো। বলেছে আর পাঁচ ছয় মিনিটের মত লাগবে। তখনই গাড়ির হর্ন শোনা গেলো। তারান্নুম ছুটে গেলো মামাকে এগিয়ে আনতে।

তারান্নুম সিঁড়ি বেয়ে নিচে এলো। ওর মামা সাইফ রহমান গেইটের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে বললেন, কেমন আছো তারান্নুম মণি? মৃদুহেসে তারান্নুম বললো, হ্যা ভালো। নানা নানু সবাই কেমন আছে? এমন সময় মিসেস হক সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বললেন, আরে পাগলি মেয়ে; আগে তোমার মামাকে ভেতরে নিয়ে আসো, পরে ইচ্ছেমত গল্প করবে।

তারান্নুম হেসে উঠলো, হুম; তাই তো!

২

কদিন পরেই ঈদ। তারান্নুম এখনো ঈদের শপিং করেনি। ওর মামার জন্য অপেক্ষা করেছিলা। ওর মামাকে ওদের বাসায় আনতে কতো যে অনুরোধ করতে হয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। ওর নানাবাড়ি চট্টগ্রামে। ওর মামা ব্যাবসা করেন। তারান্নুমরা ঢাকায়-ই থাকে। তারান্নুম ওর মা-বাবার একমাত্র আদরের দুলালী। ওর বয়স নয়ে পড়েছে কেবল। খুবই চঞ্চল। আজ তারান্নুম ওর মামার সাথে মার্কেটে যাবে। ওর মা ওকে হালকা সাজিয়ে দিলেন। নিজেদের গাড়ি নিয়ে ওরা ছুটলো মার্কেট অভিমুখে।

মামার সাথে মজার মজার গল্প করতে করতে কখন যে গাড়ি এসে থামলো মার্কেটে, তারান্নুম টেরই পেলো না। গাড়ি থেকে নামতেই তারান্নুমের সমবয়সী একটি মেয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো। গায়ে তালিযুক্ত পোশাক, চুলগুলো এলোমেলো। তবে চেহারাটা বেশ মায়াবী। মেয়েটি ওর মামাকে বললো, ভাইসাহেব, আমাকে দশ টাটাকা দেন। আমার মা খুব অসুস্থ, ছোটবোনটি খিদের জ্বালায় কাঁদতে কাঁদতে এখন বোবার মত চুপসে গিয়েছে। মামা বললেন, যাওতো এখন, বিরক্ত করো না।

মেয়েটি এবার অনুরোধের স্বরে বললো, ভাইজান, আমার প্রতি একটু দয়া করুন। আমার বাবা বেঁচে নেই। মামা রাগান্বিত স্বরে বললেন, সর এখান থেকে। মেয়েটি আবারো কিছু বলতে চাইলো। তখনই মামা মেয়েটিকে সর বলে সজোরে ধাক্কা মারলেন। মেয়েটির দুর্বল শরীর আর স্থির থাকতে পারলো না, ছিটকে পড়লো রাস্তার পাশে।

মামার এই অমার্জিত আচরণ দেখে ভীষণ আহত ও মর্মাহত হলো তারান্নুম। একরাশ কষ্ট এসে বিঁধলো তারান্নুমের ছোট্ট হৃদয়ে। কিন্তু ও তখন কিছুই বললো না। চারপাশে অনেক মানুষ থাকা সত্ত্বেও কেউ এর প্রতিবাদ করলো না।

৩

তারান্নুমের মন ভীষণ খারাপ। বারবার ওর মামার এই আচরণ ওকে ভাবিয়ে তুলছে। মানুষ এতো নির্দয় হতে পারে তা হয়তো তারান্নুমের আগে জানা ছিলো না। তারান্নুম আরো আশ্চর্য হলো এই কথা ভেবে যে, যখন ওর মামা মেয়েটিকে ধাক্কা মেরে রাস্তায় ফেলেছিলেন তখন তো কতো মানুষ এই দৃশ্য দেখেছে, কিন্তু কেউ-ই কেন এর প্রতিবাদ করলো না? মেয়েটিকে কেউ-ই তখন রাস্তা থেকে তুললো না। মেয়েটির কী এমন দোষ যে ওর প্রতি সবার এতো অনীহা? বিন্দু পরিমাণও মানুষের কাছের মেয়েটির মুল্য নেই? কী দোষ মেয়েটির?

পাঁচটি দামি জামা, দুই জোড়া জুতো, সাথে আরও অনেক কিছুই কিনেছে তারান্নুম; কিন্তু কিছুই তারান্নুমের মনে

আনন্দ দিতে পারছে না। ওর এখন কেবল একটাই ভাবনা, কীভাবে সেই পথশিশুকে ও সাহায্য করবে।

৪

আজ ঈদের দিন। তারান্নুমের আম্মু কতো কিছুরই আয়োজন করেছেন। কোরমা, পোলাও-এর সুঘ্রাণে ভরে গেছে পুরো বাড়ি। তারান্নুম গোসল করে ওর পুরনো জামাটি পরলো। তা দেখে ওর মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন, কী ব্যাপার তারান্নুম, ঈদের জামাটি পরলে না যে?

তারান্নুমের ছোট জবাব, এমনি।

মামা অবাক হয়ে বললো, ওমা! আজ না ঈদের দিন, ভুলে গেলে না কী? আজ যে মামা তোমাকে নিয়ে কত জায়গায় ঘুরবো। যাও তাড়াতাড়ি নতুন জামাটি পরে এসো।

তারান্নুম বসে রইলো, কোনো কথাই বললো না। নীরবে চোখের অশ্রু ফেললো কেবল।

এ সময়ে তারান্নুমের আম্মু রুমের ভেতরে প্রবেশ করলেন। তারান্নুমের চোখ জলে ভরা দেখে তিনি আঁৎকে উঠলেন, এ কি তারান্নুম! তুমি কাঁদছো কেন? কী হয়েছে তোমার?

তারান্নুমের কান্না আরো বৃদ্ধি পেলো। ও জোরে কেঁদে উঠলো। তারান্নুমের কান্নার আওয়াজ শুনে পড়িমড়ি করে ছুটে এলেন ওর আব্বু। এসেই তারান্নুমকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কী হয়েছে মা তোমার? বলো, আমার কাছে বলো।

তারান্নুম কান্না থামিয়ে ওর মামার দিকে তাকিয়ে কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে বললো, আচ্ছা মামা, একটি কথা সত্যি করে বলবে?

সাইফ রহমান বললেন, হুম, অবশ্যই। বলো কী?

তারান্নুম শান্তস্বরে বললো, আমি যদি কোনো গরিব পরিবারে জন্ম নিতাম, আর আমার যদি ঝলমলে পোশাক না থাকতো তাহলে কী তুমি আমাকে স্নেহ করতে? একটু ভালোবাসতে?

তারান্নুমের এই কথা শুনে সাইফ রহমানের বুঝতে বাকি রইলো না যে তারান্নুম কেন এই কথা বলছে। সেদিনের দৃশ্যটি তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো। তারান্নুমের মা-বাবা তারান্নুমের এই কথার কোনো মানে বুঝলেন না। একে অপরের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন কেবল।

সবাই নিশ্চুপ। তারান্নুম আবার বলে উঠলো, কথা বলছো না কেন মামা? জানো মামা, সেদিন যখন তুমি মেয়েটিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলে তখন আমি কতোটুকু কষ্ট পেয়েছিলাম? জানো মেয়েটি কতোটুকু ব্যাথা পেয়েছিলো? মেয়েটি খুব কেঁদেছিলো, কিন্তু রাস্তার শত মানুষ থাকা সত্ত্বেও একজন মানুষও মেয়েটিকে কাছে ডাকেনি। কারণ মেয়েটির টাকা-পয়সা নেই তাই। সুন্দর জামা নেই, তাই। আর আমি আজ চোখের পানি ফেলতে না ফেলতেই তোমরা সবাই এসে হাজির। আদুরে সুরে সবার কত অনুরোধ, কী হয়েছে আমার জান! মামা, সেদিন আমার কাছে মনে হয়েছিলো, তুমি এবং রাস্তার পাশে যারা দাঁড়ানো ছিলো, তোমরা কেউই মানুষ নও। তোমাদের কারো মনে মানবতাবোধ নেই। গরিব মানুষকে দেখলেই তোমাদের ঘৃণা লাগে। অথচ মামা, ওরা ও তো মানুষ। আমাদের স্কুলের ম্যাডাম বলেছেন...।

তারান্নুমকে আর কিছু বলতে না দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বাচ্চাদের মতো কেঁদে উঠলেন সাইফ রহমান। তারান্নুমের এই কথা শুনে মা-বাবা উভয়েই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তাদের চোখ বেয়ে ঝরলো আনন্দাশ্রু। তারান্নুমের মামা কান্নামিশ্রিত গলায় বললেন, হুম, তুমি ঠিকই বলেছো তারান্নুম। আমার মতো মানুষ যারা, তারা মানুষ নামের কলংক। আজ তোমার এই কথা শুনে আমি শপথ করলাম, আর কখনো আমি গরিবদের অবহেলা করবো না। আর যারা এমন ভুল করে ওদেরকেও বুঝাবো। চলো, আমরা সেই মেয়েটিকে খুঁজে নিয়ে আসি। তারপর ওকে গোসল করিয়ে তোমাদের দুজনকে একসাথে বেড়াতে নিয়ে যাবো।

ওর মামার এই কথা শুনে তারান্নুম এতোই আনন্দিত হলো যে, কোনো কথাই বলতে পারলো না। শুধু বললো, আলহামদুলিল্লাহ!

ফরম আপনার স্বপ্ন আমাদের ব্যাখ্যা

নাম :

পূর্ণ ঠিকানা :

বয়স : পেশা :

শিক্ষা : বিবাহিত/অবিবাহিত :

স্বপ্ন দেখার তারিখ রাত/দিনের কখন?

স্বপ্ন দেখার সময় আবহাওয়া কেমন ছিল?

স্বপ্ন দেখার সময় আপনি পবিত্র না অপবিত্র ছিলেন।

যে বিষয়ে স্বপ্ন দেখেছেন, সম্প্রতি সে বিষয়ে কোন আলোচনা বা চিন্তাভানা করেছেন কিনা?

এই রোগগুলোর কোনটা থাকলে টিকচিহ্ন দিন : কোষ্ঠকাঠিন্য, ঠাণ্ডা রোগ, ডায়বেটিকস্, হাই/লো প্রেসার।

বিশেষ কোন বিষয়ে দুশ্চিন্তা থাকলে তার বিবরণ।

জীবনে বিশেষ কিছু হতে চান কিনা? বিবরণ।

বিশেষ কোন সংগঠন বা কর্মকাণ্ডে জড়িত আছেন কিনা?

টিকচিহ্ন দিন : আপনি– রাগী–বিনয়ী–অহংকারী–দুশ্চিন্তাগ্রস্ত–ভিতপ্রকৃতির, খুঁতখুতে স্বভাবের বা

টিক চিহ্ন দিন : নাম প্রকাশে ইচ্ছুক/অনিচ্ছুক। মোবাইল :

এই ফরমটি পূরণ করে, আলাদা কাগজে আপনার সম্প্রতি দেখা স্বপ্নের পূর্ণ বিবরণ লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়।

জীবনযুদ্ধ

শুকানো গোলাপ

মাছুরা আক্তার বেলী

বাবা-মায়ের অতি আদরের সন্তান রাইসা। দেখতে খুবই সুন্দরী। যেমন রূপ তেমনি গুণে গুণান্বিত। ঠিক যেন তার মায়ের মতো। রাইসার বাবা ইব্রাহিম সাহেব শিক্ষকতা করেন। ছয় মেয়ের মধ্যে রাইসা দ্বিতীয়। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন অনেক আগেই। বাকিগুলো সব ছোট। এদেরকে নিয়েই চলছিলো ইব্রাহিম সাহেবের সুখের সংসার।

দিন পেরিয়ে মাস মাস পেরিয়ে বছর। রাইসাও বড় হতে থাকে। স্কুল পেরিয়ে কলেজ, কলেজ পেরিয়ে ভার্সিটির আঙ্গিনা। বাবা-মায়ের চিন্তায় ছেদ পড়ে– মেয়ে তো অনেক বড় হয়ে গেলো। প্রতীক্ষা একটা ভালো ছেলের জন্য।

একদিন ইব্রাহিম সাহেব শহরে কী যেন কাজে যাচ্ছিলেন। পথে হঠাৎ ছোটকালের বন্ধু আব্দুল কাদেরের সঙ্গে দেখা হয়। অনেকদিন পর দুই বন্ধু একে অপরকে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা। একবারেই জড়াজড়ি। কেমন আছো, কী করছো, ছেলে-মেয়ে কয়জন কোন প্রশ্নটি আগে করবে যেন দিশেহারা। তারপর একেক করে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া-নেওয়া হয়। কতো বছরের না বলা কথাগুলো যেন শেষ হয় না।

এভাবে এই বাঁধনে এখন আর মন ভরে না, এই বাঁধনকে আরও গাঢ় করা চাই। এই লক্ষ্যেই একদিন আব্দুল কাদের সাহেব বন্ধুর কাছে বলে- তোমার কাছে একটি জিনিস চাইবো। ফিরিয়ে দিবে না তো। ইব্রাহিম সাহেব জানতে চাইলে বলে, ভয় হয় যদি ফিরিয়ে দাও। ইব্রাহিম সাহেব অভয় দিলে কাদের সাহেব বলেন, আমার ছেলে সাঈদ-এর জন্য তোমার মেয়ে রাইসাকে পুত্রবধূ করে ঘরে তুলতে চাই। বন্ধুর এরকম প্রস্তাবে ইব্রাহিম সাহেব অমত করতে পারে না।

কারণ সাঈদ যেমনিভাবে সরকারি চাকুরিজীবী অন্যদিকে বন্ধুর ছেলে তাই এই প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দিতে পারেন না, সাদরে গ্রহণ করেন। এরপর দুই বন্ধুর আলোচনা সাপেক্ষে বিয়ের দিন তারিখ নির্ধারন করা হয়।

নির্ধারিত তারিখে সাঈদের সাথে রাইসার বিয়ের কার্যাদি খুব সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হয়। ইব্রাহিম সাহেব তো মহাখুশি উপযুক্ত পাত্রের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে পেরে। রাইসাও পরম ভালোবাসায় বরণ করে নেয় সাঈদকে। কিন্তু হায়! দু'দিন পর মলিন হয়ে যায় রাইসার হাসিমাখা মুখটি। শুরু হয়ে যায় দাম্পত্যজীবনের অশান্তি। রাইসার জীবন থেকে চিরতরে পালিয়ে যায় সুখপাখিটা। সব স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। আশাগুলো কাঁটা হয়ে আঘাত করতে থাকে। চারদিকে সে অন্ধকার দেখতে পায়।

আসলে সাঈদ ছিলো একটা কুৎসিত মনের বেহায়া ছেলে। তার গোপন প্রেম ছিলো অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে। যার জন্য সে রাইসার সাথে স্ত্রীর অধিকার বজায় রাখতে পারেনি। এ কারণে দিনের পর দিন রাইসাকে সহ্য করতে হয়েছে দাম্পত্যজীবনে অনেক দুর্ব্যবহার। রাইসা সব নীরবে সয়ে যায়। কী করবে ভেবে পায় না। রাইসাও বুঝতে পারে সাঈদের গোপন সকল ঘটনা। রাইসার চেখে যখন সকল ঘটনা পরিস্কার হয়ে যায় তখন রাইসা আর নিজেকে সামলে নিতে পারে না। তার কাছে সমস্ত পৃথিবীটা অসার সমুদ্রের মতো মনে হয়। এরপর রাইসা শশুরবাড়িতে যেতে অস্বীকৃতি জানালে রাইসার বাবা-মা অনেক বুঝিয়ে এবারের মতো রাইসাকে শশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

কিন্তু এবার রাইসার জীবনে নেমে আসে অমাবস্যার কালো আঁধার। রাইসা সাঈদের জীবনপথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। অমানুষিক নির্যাতন করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং রাইসাকে পৃথিবী থেকে চিরতরের জন্য পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। রাইসা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। রাইসাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু ততক্ষনে দেরি হয়ে গেছে। রাইসা এ ধরা থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে পাড়ি জমিয়েছে পরপারে। হারিয়ে যায় সেই সোনা মুখখানি। এভাবে রাইসার বাবা-মা ডুকরে কেঁদে উঠে, সঙ্গে ছোটবোন ফাতেমাও। ছোটবোনরা বোনকে হারানোর ব্যথা অনুভবে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদে। এভাবে ঝরে পড়লো সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপটি।

আজও দেখতে পাই ইব্রাহিম সাহেবের চেখে অশ্রুর বন্যা, শুনতে পাই রাইসার মায়ের কান্নার করুণ সুর। আরও দেখতে পাই ছোট বোনদের হৃদয়ের মায়াকান্না।

আমি সকল অবিভাবকের উদ্দেশে বলতে চাই, মেয়েকে বিয়ে দিবেন তো একটু যাচাই করে দেখুন। খোঁজখবর নিয়ে দেখুন ছেলের চরিত্র আচার-ব্যবহার সর্ম্পকে। এটা তো আপনার কোনো গৃহপালিত পশু নয় যে বিক্রি করলেন আর চলে গেলো। এটা হচ্ছে আপনার হৃদয়ের রত্ন, বুকের ধন। তাকে সঠিকভাবে সঠিক মানুষের হাতে তুলে দিন।

যখন ভাবি রাইসা আর পৃথিবীতে নেই তখনই নিজের অজান্তে ক' ফোটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠে, কিছুই ভালো লাগে না। তখন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারি না। শুধু মনে হয়– পৃথিবীটা এত নিষ্ঠুর কেন?

ইতিহাসের ডালি থেকে

যাকিয়া যায়নাব

সাহাবায়ে কেরাম তখন নামাজরত

সোমবার রবিউল আউয়াল মাস। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত দুর্বল। অসুস্থ তিনি। মসজিদে আসতে পারেন না। প্রিয়নবির প্রিয় সাহাবি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাজের ইমামতি করছেন। সাহাবায়ে কেরাম জামাতে ইমামের পেছনে নামাজরত। প্রিয়নবি হুজরা মোবারকের পর্দা তুলে তাদের দিকে এক পলক তাকালেন। তাঁর চেহারা মোবারক ঝলমল করছিলো। সাহাবিদেরকে জামাতে নামাজরত অবস্থায় দেখে খুব আনন্দিত হলেন তিনি। মুচকি হাসলেন। নবিজির মুচকি হাসি দেখে আনন্দে সাহাবা কেরামদের নামাজ ছুটে যাওয়ার উপক্রম হলো। আবু বকর রা. পেছনে চলে আসতে চাইলেন। কিন্তু প্রিয়নবি ইশারায় নামাজ চালিয়ে যেতে বললেন এবং পর্দা ছেড়ে দিলেন। এটাই ছিলো পৃথিবীতে তার শেষদিন। এদিনই প্রিয়নবি সুমহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।

আহ! মৃত্যুও এমন মধুর

সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভি রহমাতুল্লাহি আলায়হি একটি জীবন, একটি আদর্শ, একটি প্রতিষ্ঠান এবং একটি ইতিহাস। এই পৃথিবী তাকে পেয়ে যেমন ধন্য হয়েছে তেমনই তাকে পেয়ে হারিয়ে শোকে কাতর হয়েছিলো। ১৯৯৯ সালে ৩১ ডিসেম্বর এই মহামানব পরলোক গমন করেন। তার জীবনের পুরো সময়টা কেটেছে ইলম সাধনার মাঝে এবং তার শুভসমাপ্তি ঘটেছে মহান আল্লাহর ক্ষমা ও দানের এক অপূর্ণ ইশারায়।

দিনটি ছিলো শুক্রবার। সকাল থেকেই যেন তিনি 'অন্যমানুষ' হয়ে গেলেন। হয়তো প্রিয়তমের সঙ্গে পরম মিলনের শুভ ইঙ্গিত এসে গিয়েছিলো। তাই সকাল থেকেই আয়োজন ও প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেলো। বয়স তার নব্বইয়ের কাছাকাছি। অসুস্থতা ও দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও জুমার প্রস্তুতি নিলেন। খাদেম তাকে গোসল করিয়ে দিলো। জুমার সময় সন্নিকটে। কোরআন শরিফ খুললেন। সুরা কাহফ-এর স্থানে সুরা ইয়াসিন বের হলো। তিনি সুরা ইয়াসিনই তেলাওয়াত শুরু করলেন। মহান রাব্বুল আলামিনের অপার মহিমা!

তার হৃদয় কী তখন অনুভব করতে পেরেছিলো, রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে মিলিত হবার শুভক্ষণ সমোপস্থিত? তার নিবেদিত আত্মা কী বুঝতে পেরেছিলো, তার জন্য মহান আল্লাহর অনুগ্রহের কথা? এক দুই আয়াত করে তিনি সুরা ইয়াসিনের এগারো নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করলেন। যার অর্থ, হে নবি! আপনি শুধু তাকেই সতর্ক করতে পারবেন যে উপদেশ শোনে এবং না দেখেই করুণাময় আল্লাহকে ভয় করে।

তিনি আরও অগ্রসর হলেন এবং আয়াতের শেষাংশ তেলাওয়াত করলেন– তুমি তাকে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের সুসংবাদ দাও।

এই আয়াতটি শেষ হওয়ার মাধ্যমে একজন আশেকে

নবির পুণ্যময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলো। কোরআন পড়তে পড়তেই তিনি পরমপ্রিয় মওলার কাছে চলে গেলেন।

গায়রত

শত বছর আগের ঘটনা। গোয়ালিয়রের এক হিন্দু রাজার অধীনে সৈনিকের চাকরি করতো মুসলিম-হিন্দু সব ধর্মের লোকেরাই। ধর্মীয় বিষয় আশয়ে তাদের ওপর রাজার পক্ষ থেকে কোনো আদেশ নিষেধ থাকতো না। সবাই স্বাধীনভাবেই যার যার ধর্মকর্ম পালন করতো। যেমন দাড়ি রাখা না রাখার বিষয়ে তারা ছিলো স্বাধীন।
ওই রাজার এক মুসলিম সৈনিক দাড়ি কামিয়ে ফেলতো। কিছু দাড়িওয়ালা মুসলিম সৈনিক তখন তাকে গালমন্দ করতো– তুমি দাড়ি কামিয়ে ফেলো কেন? সে বলতো, ভাই গোনাহ করেছি আল্লাহ মাফ করে দিবেন।
এর কিছুদিন পর রাজার পক্ষ তেকে নির্দেশ জারি হলো, সৈনিকদের মাঝে কেউ দাড়ি রাখতে পারবে না। যেসব মুসলমান সৈনিক তাকে দাড়ি না রাখার জন্য গালমন্দ করতো তারা ভয় পেয়ে গেলো এবং নিজেদের দাড়ি কামিয়ে ফেললো। এরপর থেকে তারা তাকে বললো, তোমারই জিত হলো। এখন থেকে তোমার চাহিদাই পুরো হবে।
সে জিজ্ঞেস করলো, কেন, কী হয়েছে? তারা বললো, এখন রাজার পক্ষ থেকে নির্দেশ এসে গেছে, সৈনিকদের কেউ দাড়ি রাখতে পারবে না। এই জন্য আমরা সবাই দাড়ি কামিয়ে ফেলেছি।
তখন সেই দাড়ি কামিয়ে ফেলা সৈনিকটি বললো, আরে মিয়া, এতোদিন যে আমি দাড়ি কামিয়েছি আর খোদার নফরমানি করেছি সেটি করেছি নিজের রিপুর তাড়নায়। কিন্তু এখন যেহেতু খোদার এক অবাধ্য কাফের দাড়ি কামানোর হুকুম দিয়েছে তাই দাড়ি কামানো আত্মমর্যাদা হানিকর কাজ হয়ে গেলো। আমি দাড়ি রেখে দেবো।
তারা তাকে বললো, যদি দাড়ি রাখো তাহলে সৈনিকদল থেকে তোমাকে বরখাস্ত করে দেয়া হবে।
তখন সে বললো, আল্লাহ রিজিকদাতা। তিনি অন্য কোনো পথ নিশ্চয়ই বের করে দিবেন।
এটা হলো ঈমানিশক্তি ও ইসলামি আবেগ। এটাকে বলা হয় ইসলামের প্রেরণা ও গায়রত। কিন্তু আজ মুসলমানরা নিজেরাই দুর্বলতা ও নতজানু হওয়ার পথ ধরেছে। তারই ফল আজ চারদিকে প্রকাশ হচ্ছে।

(ইরশাদাতে হাকিমুল উম্মত)

মাটির ঘর

তার বাড়িটি ছিলো কাঁচামাটির তৈরি। পাকা দালানকোঠা তার বাড়িতে ছিলো না। বর্ষার সময় ঘরের মধ্যে পড়তো বৃষ্টির পানি। নরম হয়ে যেতো মাটির দেয়াল। প্রতিবছর তাকে বাড়িঘরে কিছু কিছু মেরামতের কাজ করাতে হতো।
তাঁর ছিলো এক যোগ্য ও গুণী ছাত্র। সে ছাত্র এমন অবস্থা দেখে একদিন তাকে বললো, উস্তাদজি, প্রত্যেক বছর আপনি বাড়ি মেরামত করান। এভাবে বছর বছর টাকাও খরচ হয় সময়ও নষ্ট হয়। পাকা বাড়ি বানিয়ে ফেললেই তো সমস্যা শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এটুকু সামর্থ্য তো দিয়েছেন। এটা করলে প্রতিবছর খরচ করা থেকেও বেঁচে যাবেন।
গুণী ছাত্রের কথা শুনে উস্তাদ বললেন, বাহ বাহ! তুমি কতো বুদ্ধির কথা বললে। আমি তো সারাটা জীবন পার করে দিলাম, বুড়ো হয়ে গেলাম। এখনও বিষয়টা বুঝতে পারলাম না।
উস্তাদের মুখে বার বার এ কথাগুলো শুনে বুদ্ধিমান ছাত্রটি লজ্জিত হয়ে বললো, কথাগুলো আমি আসলে এজন্য বলছি যে, পাকাবাড়ি বানানোর মাঝে যদি কোনো হেকমত থাকে তাহলে সে কারণটি সর্ম্পকে আমিও জানতে পারতাম।
উস্তাদ তখন বললেন, এসো, আমি তোমাকে বলছি। এ কথাগুলো বলে ছাত্রের হাত ধরে তাকে নিজের বাড়ির দরজার সামনে নিয়ে এসে বললেন, দেখো তো, এই গলিতে ডানে বাঁয়ে সামনে পেছনে কোথাও কোনো পাকাবাড়ি তোমার নজরে পড়ে কী-না?
ছাত্র বললো, জি না।
এরপর উস্তাদ বললেন, আমার সব প্রতিবেশীর বাড়ি কাঁচামাটির দেয়ালের। এই গলিতে একা আমার বাড়িটি পাকা করে বানালে সেটা কী ভালো দেখাবে? আমার তো এ সামর্থ্য নেই যে, প্রত্যেক প্রতিবেশীর বাড়ি পাকা করে দেবো। এ জন্য আমার বাড়িটাও আমি পাকা করিনি। যেন আমার প্রতিবেশীরা মনোকষ্টে না ভুগে।
এই গল্পের উস্তাদ ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দের প্রখ্যাত উস্তাদ মাওলানা সাইয়েদ আসগার হোসাইন রহ. আর ছাত্রটি ছিলেন পাকিস্তানের মুফতিয়ে আজম মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ.।

জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা

সুলতান মাহমুদের দরবারে এমন অনেক 'নুজুমি' পণ্ডিত ছিলো যাদের তুলনা সারা সাম্রাজ্যে ছিলো না। কিন্তু সুলতান তাদের কাছে কখনো কিছু জিজ্ঞেস করতেন না। এক দরবারি একদিন জিজ্ঞেস করলো, হুজুরের দরবারে এতো 'নুজুমি' পণ্ডিত কিন্তু হুজুর কখনো তাদের কাছে কিছু জানতে চান না। তাহলে এদের থাকায় লাভ কী?
সুলতান বললেন, এদেরকে শুধু এ জন্য রাখা হয়েছে যে, দেশে সব বিষয়েরই পণ্ডিত থাকা দরকার। যেন কখনো কোনো প্রয়োজন হলে অসুবিধায় পড়তে না হয়।
তবে তাদের কাছে কোনো কিছু জানতে না চাওয়ার কারণ হলো– আমার সকল কাজের ভিত্তি দুইটি– ১. আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা ২. শরিয়তের ফতোয়া ও জ্ঞানী সুহৃদদের পরামর্শ।

(জাওয়ামিউলি হিকায়াত)

প্রজাপালন

সুলতান মাহমুদ সুশ্রী ছিলেন না। একদিন তিনি খাসকামরায় নামাজ পড়ছিলেন। দুজন খাদেম তার নিকটে আয়না ও চিরুনী রেখে গেলো। ইতিমধ্যে উজির আহমদ হাসান কামরায় প্রবেশ করলেন এবং অভিবাদন জানালেন। সুলতান নামাজ শেষে

শাহিপোশাক পরিধান করলেন এবং মাথায় মুকুট পরলেন। এরপর আয়নায় চেহারা দেখে মুচকি হাসলেন। উজির সামনে উপস্থিত ছিলেন। সুলতান তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলতে পারেন এখন আমি কী ভাবছি? উজির বললেন, বাদশাহ নামদার, আপনিই বলুন। সুলতান বললেন আমার আশঙ্কা হয়, লোকেরা আমাকে ভালোবাসবে না। কেননা মানুষ এমন বাদশাহকেই ভালোবাসে যার চেহারাও সুন্দর হয়। উজির আহমদ হাসান বললেন, বাদশাহ নামদার। কেবল একটি কাজের মাধ্যমেই আপনি প্রজাদের ভালোবাসা পেতে পারেন। এমনকি আগুন ও পানির উপরও আপনার ফরমান চলতে পারে। সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, কী সেই কাজ?

উজির বললেন, অর্থকে শত্রু মনে করুন, সকল প্রজা আপনার বন্ধু হয়ে যাবে।

কথাটা সুলতানের খুবই মনঃপুত হলো এবং প্রজা সাধারণের জন্য বখশিশের হাত উন্মুক্ত করে দিলেন। অল্পদিনেই সাম্রাজ্যের চারদিকে সুলতানের সুনাম ছড়িয়ে পড়লো।

(সিয়াসতনামা)

ন্যায়বিচার

সুলতান গিয়াসুদ্দিন বুলবনের আমলে বাদায়ুনের এক প্রশাসক অত্যন্ত শান-শওকতের সঙ্গে থাকতো। সবসময় চার হাজার অশ্বারোহী তার হুকুম তামিলে প্রস্তুত থাকতো। সে একদিন এক নওকরের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে এতো চাবুক মারলো যে, সে মৃত্যুবরণ করলো। কিছুদিন পর সুলতান গিয়াসুদ্দিন শাহি পরিদর্শনে বাদায়ুন পৌছলে ওই নওকরের বিধবা স্ত্রী সুলতানের কাছে অভিযোগ দায়ের করলেন। সুলতান গোটা বিষয়টা শোনার পর আদেশ দিলেন প্রশাসককেও এতোগুলো চাবুক মারা হোক যতগুলো সে ওই নওকরকে মেরেছিলো। শাহি হুকুম তামিল করা হলো। শাস্তি সহ্য করতে না পেরে ওই প্রশাসকও মারা গেলো। সুলতানের আদেশে তার লাশ শহরের ফটকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো যেন জালেম শাসকরা ভবিষ্যতে জুলুম করার সাহস না পায়।

(তারিখে ফেরেশতা)

আলেম ও আমির

আবু হাজিম সালামা ইবনে দিনার একজন বিখ্যাত তাবেয়ি ছিলেন। তিনি মদিনায় বসবাস করতেন। খলিফা সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিক মদিনায় এলে বিশিষ্টব্যক্তিরা তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন মদিনায় এমন কেউ কি আছেন যিনি একাধিক সাহাবির সাহচর্য লাভ করেছেন?

আবু হাজিম রহ.-এর কথা বলা হলো। খলিফা তার নিকট দূত পাঠালেন। আবু হাজিম রহ. উপস্থিত হলে খলিফা অনুযোগ করে বললেন, হে আবু হাজিম, এ কেমন অসৌজন্যতা!

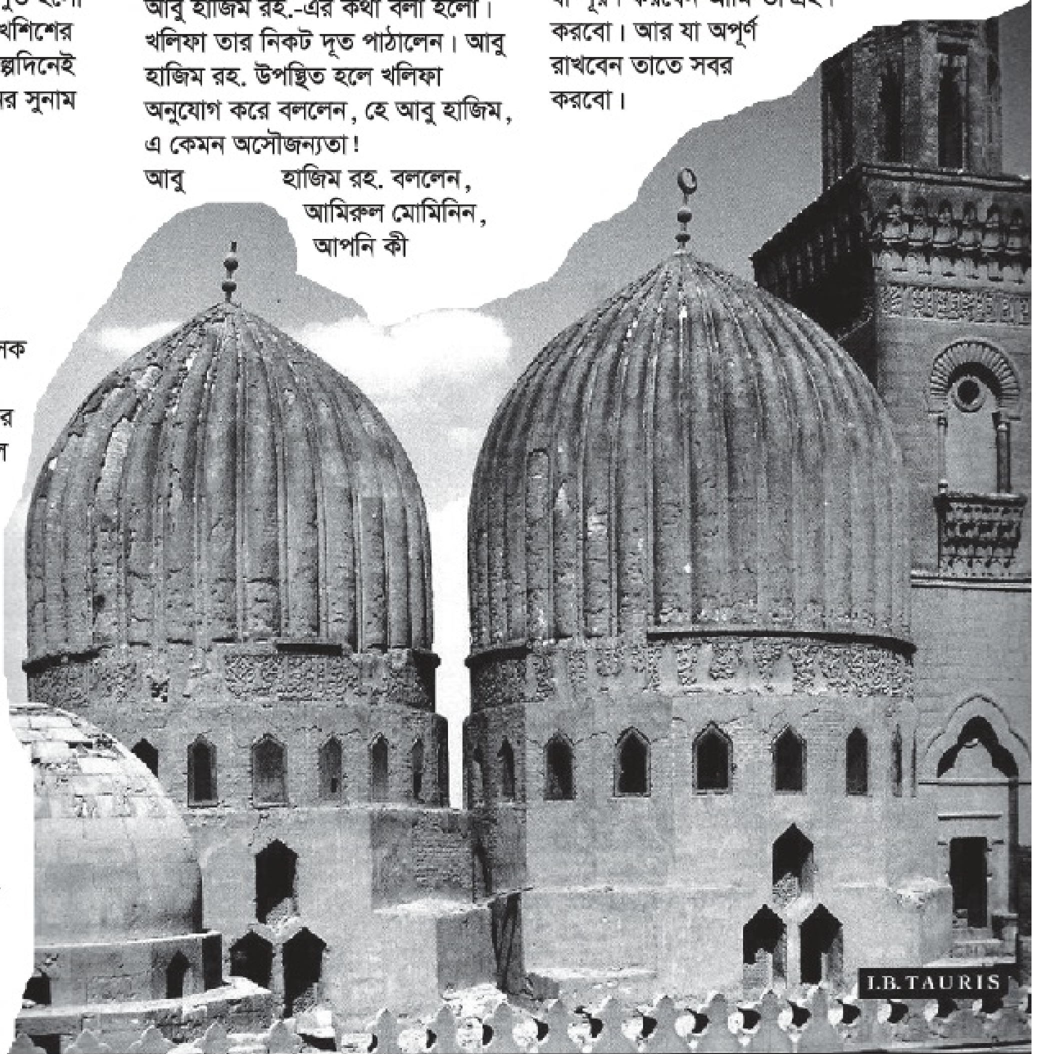
আবু হাজিম রহ. বললেন, আমিরুল মোমিনিন, আপনি কী অসৌজন্যতা দেখতে পেয়েছেন?

খলিফা বললেন, মদিনার বিশিষ্টব্যক্তিরা সবাই আমার কাছে এলেন, কিন্তু আপনি তো এলেন না।

আবু হাজিম বললেন, আমিরুল মোমিনিন, আমি তো আপনার পরিচিতব্যক্তি নই। অতএব এই অনুযোগ যথার্থ নয়। সুলায়মান প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, হে আবু হাজিম, আমরা কেন মৃত্যুকে ভয় পাই?

আবু হাজিম রহ. বললেন, আপনারা দুনিয়া আবাদ করেছেন এবং আখিরাত বরবাদ করেছেন। তাই আবাদি ছেড়ে বরবাদির দিকে যেতে আপনাদের ভয় হয়।

অন্য বর্ণনায় আছে, খলিফা বললেন, আপনার কোনো প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলুন। আবু হাজিম রহ. বললেন, আমি তো আমার সকল প্রয়োজন এমন একজনকে জানিয়েছি, যার কাছে এর মর্যাদা নষ্ট হবে না। তিনি যা পূরণ করবেন আমি তা গ্রহণ করবো। আর যা অপূর্ণ রাখবেন তাতে সবর করবো।





জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিম নারী

আরিফ বিল্লাহ

বিদ্রোহী কবি বলেছেন, 'পৃথিবীতে যা কিছু মহান চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।'

মহান প্রভু আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে নর ও নারী এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করে পাঠিয়েছেন এ পৃথিবীতে। উভয়ের মাঝে আকৃতিগত কতিপয় পার্থক্য ছাড়া আর কোনো তফাৎ রাখেননি; বৈষম্য করেননি। এ সমাজের ভারসাম্য রক্ষায় কারো ভূমিকাকেই ছোট করে দেখেননি; সমমর্যাদা দিয়েছেন। বিবেক-বুদ্ধি-মেধাতেও কোনো কম-বেশি করেননি; কাউকে ঠকাননি; বঞ্চিত করেননি। উভয়ের অবদানকে মর্যাদা দান করেছেন। কবির পঙক্তিতে তারই প্রতিধ্বনি ফুটে ওঠেছে। আমাদের নবি মুহাম্মদ সা.-এর সময়কাল ছিলো অন্ধকারাচ্ছন্ন, বর্বরতায় ছেয়ে যাওয়া এক সমাজ। ধর্মীয় শিক্ষা, আধুনিক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিলো প্রায় প্রতিটি জনপদ। তখনও মুসলিম মহীয়সী নারীরা তাদের মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন; অবদান রেখেছেন প্রতিটি শাখায়। সাহিত্য-বিজ্ঞান-ধর্ম-দর্শন-যুক্তিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই ছিলো মুসলিম নারীর পদচারণা। এ সমাজকে এগিয়ে নিতে তারা অগ্রদূতের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিলেন।

সাহাবি নারীদের মধ্যে যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান রেখেছেন, ১. উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা [মৃ. ৫৭ হি.] ছিলেন বহু প্রতিভার অধিকারী; মুহাদ্দিসা, ফিকহবিদ, কাব্য রচয়িতা, চিকিৎসক ও শিক্ষক। সর্বাধিক হাদিস বর্ণনার তালিকায় তিনি দ্বিতীয় অবস্থানে। জঙ্গে জামালে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২. উম্মে দারদা রা. ছিলেন ইসলামি আইনজ্ঞ, মুহাদ্দিসা, ফিকহবিদ ও বিতার্কিক। ৩. আল-শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ রা. ছিলেন শিক্ষাবিদ ও চিকিৎসক। ওমর রা. তাকে বাজার নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

ইসলামি ইতিহাসে পরবর্তীতে যেসব নারী জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান রেখেছেন, ১. রাবেয়া বসরি রহমাতুল্লাহি আলায়হা [মৃ. ১৯২ হি.] ইলমে মারেফাত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রথম রাহবার, সুফি দর্শনের প্রবক্তা। তার বিখ্যাত ছাত্রদের একজন হলেন হাসান বসরি রহ.। ২. ফাতিমা আল-ফিহরি [মৃ. ১৭১ হি.] মরক্কোতে মসজিদ ও ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন, যে প্রতিষ্ঠানটি আজও তার গৌরব রেখে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি মৃত্যুর আগে সমস্ত সম্পদ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান করে যান। ৩. লুবনা আন্দালুসি [কর্ডোভার খলিফার মেয়ে] ব্যাকরণ ও কাব্যিক প্রতিভার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি কর্ডোভার লাইব্রেরির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন। ৪. ফাতিমা আল-সমরকন্দি [আল-বাদায়ি ওয়াল সানায়ি গ্রন্থের প্রণেতা আলাউদ্দিন কাছানির স্ত্রী] ছিলেন মুসলিম স্কলার ও আইনবিদ। বর্ণিত আছে, ফতোয়া প্রদানে কোনো সংশয়-অস্পষ্টতা তৈরি হলে আলাউদ্দিন কাছানি ফাতেমা সমরকন্দির সহযোগিতা নিতেন। তিনি সুলতান সালাউদ্দিনের উপদেষ্টা নুরুদ্দিনের আইনি পরামর্শক ছিলেন। ৫. জয়নব আল-কিন্দি [মৃ ৬৯৯ হি.] ছিলেন মুহাদ্দিসা। তিনি বিখ্যাত মুসলিম স্কলার ও ঐতিহাসিক আজ জাহাবি রহ.-এর শিক্ষক হিসেবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ৬. জেবুন্নিসা [মৃ. ১৭০২ খৃ.] মোঘল সম্রাট আলমগিরের কন্যা। তিনি একাধিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন। কবিতা, দর্শন, ধর্ম, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, সাহিত্য ও ক্যালিগ্রাফি ইত্যাদির প্রতি তার আকর্ষণ ছিলো। তবে তিনি কাব্যিক প্রতিভার জন্যই অমর হয়ে আছেন। ৭. জিনাতুন্নিছা [মৃ. ১৭২১], মোঘল রাজকন্যা ও ফাতওয়ায়ে আলমগিরির অন্যতম সংকলক। ইসলামি জ্ঞানে তার পাণ্ডিত্য ছিলো অসাধারণ।

বিংশ শতাব্দীতে যেসব মুসলিম নারী নবজাগরণের পথ দেখায়– ১. জয়নব আল-গাজালি [মৃ. ২০০৫] মিসরীয় মুসলিম নারী জাগরণের কর্মী; মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে জড়িত ছিলেন। ইসলামি মূল্যবোধ প্রচারের দায়ে অসংখ্যবার জেল-জুলম, নির্যাতন সহ্য করেছেন। জালিম সরকারের রোষানলে পড়েছেন, তবু আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। তাফসিরসহ মুসলিম জাগরণে তাঁর অসংখ্য লেখনী রয়েছে। ২. ড. আফিয়া সিদ্দিকা [জন্ম ১৯৭২] পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত নিউরোসাইন্স চিকিৎসক। যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ২০০৩ সালে যখন পাকিস্তানে ফিরে আসেন, তখন আফগান-আমেরিকা যুদ্ধ চলছে। তিনি তালেবানদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ২০০৮ সালে তিনি আফগান পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন, পরে তাকে বিচারের নামে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে কারাগারে বন্দি রেখে শারীরিক, মানসিক নির্যাতন চালায় এফবিআই। এতেও তিনি দমে যাননি, সত্যের পথে অটল থেকেছেন।

ইসলামের সূচনাকাল থেকেই মুসলিম নারীরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশে বিরাট অবদান রেখেছেন। তাদের ইতিহাস ভুলবার নয়, বিস্মৃত হবার নয়। কিন্তু এ যুগে এসে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে; শৌর্যবীর্য হারিয়ে গেছে। মুসলিম মহীয়সী নারীদের সোনালি ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিতে হবে আজকের নারীদের। পৃথিবীর অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। তাদেরকে ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে পরিচয় না ঘটালে জাতি এগোবে না। নারী হিসেবে তাদের ভূমিকা আবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, 'কী তারা করতে পারে! কী আছে তাদের অতীত সোনালি ইতিহাস!'

শিক্ষার্থী, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



ছয়.

গুলরুখের সুর অগ্নিশিখা হয়ে জ্বলে ওঠে। শ্রোতাদের হৃদয়কে জ্বালিয়ে দিতে থাকে। প্রথম গানেই সে পুরো আসরকে মাতিয়ে ফেলে। সবাইকে তার দিয়ানা বানিয়ে বানিয়ে ফেলে। গুলরুখ অসাধারণ নাচতেও জানতো। সে এবার নৃত্য প্রদর্শনের ইচ্ছা করলো। কিন্তু শাহ তার সুরযাদুতে এমনভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়ে যে, সে আবার তার সুরবারিতে স্নাত করতে ফরমায়েশ করলো। গুলরুখ তার ইচ্ছা স্থগিত রেখে দ্বিতীয় গান ধরলো। দ্বিতীয় গান শেষ হওয়ার পর শাহ তৃতীয় গান ধরার ফরমায়েশ করলো। এভাবে গান একটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাহ আরেকটা গান শোনার জন্য মরিয়া হয়ে উঠতো। প্রায় দুই আড়াই ঘণ্টা এভাবে সুরের যাদুর জালে বন্দী থাকে শাহ। শাহ দিওয়া না হয়ে গুলরুখের জন্য শাহী ভাণ্ডার খুলে দিলো। গুলরুখ এমন মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলো যে, কোথায় দিন গিয়ে অর্ধ রাত পেরিয়ে গিয়েছে তা কেউই বুঝতে পারেনি। গুলরুখের সুরে সবাই মোহগ্রস্থ হয়ে ছিলো।

মালিক শাহ'র বয়স তখন মাত্র সাইত্রিশ। রাজা-বাদশাদের এ বয়স হলো যৌবনের স্বর্ণকাল। গুলরুখের কণ্ঠযাদুতে মালিক শাহ'র কামনার আগুন জ্বলে ওঠে।

: তোমার নাম কী?

গান শেষ হওয়ার পর মালিক শাহ নিদ্রালু দৃষ্টিতে গুলরুখকে জিজ্ঞেস করে। গুলরুখ নিজেকে খুব ভাগ্যবতী ভাবতে থাকে। এতো বড় একজন শাসক তার প্রতি এমন সদয় হবে, এটা তার জন্য ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু গুলরুখও ছিলো তার জগতের মালিকা। সে মালিক শাহ'র কথার প্রতি তেমন গুরুত্ব দিলো না।

: কানিজকে সবাই গুলরুখ বলে।

গুলরুখ শাহের আদবে নিয়মমাফিক মাথা ঝুঁকিয়ে উত্তর দেয়।

: গুলরুখ... গুলরুখ...। বড়ই অপূর্ব নাম। বড়ই মধুর নাম। কিন্তু এই নাম তোমার জন্য উপযুক্ত নয়। তোমার জন্য শাহরুখ নামই বেশি উপযুক্ত। আজ থেকে আমি তোমার নাম রাখলাম শাহরুখ।

: কানিজ অন্তরের অন্তস্থল থেকে সুলতানুল আদিল মুহতারাম মালিক শাহ'র কৃতজ্ঞতা আদায় করছি।

গুলরুখ শাহি শিষ্টাচার বজায় রেখে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাৎক্ষনিক উত্তর দেয়।

: তোমার আজকের এই পরিবেশনা আমার খুবই ভালো লেগেছে।

: শাহকে খুশি করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করছি।

: তোমার গানের কণ্ঠ বড়ই যাদুময়ী। স্রষ্টা তোমাকে অপূর্ব নেয়ামত দান করেছেন।

: আপনার কথায় কানিজ উৎসাহিত হলো।

: শাহরুখ! তোমার রূপ ও সৌন্দর্যও বড় অপূর্ব। তোমার সৌন্দর্য মালিক শাহ'র হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছে।

গায়িকা চমকে ওঠে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মালিক শাহ'র দিকে তাকায়। সুপুরুষ মালিক শাহ'র চোখমুখ থেকে সৌন্দর্যের ঝিলিক ঠিকরে পড়ছিল। গুলরুখের পরিবর্তে অন্য যে কেউ হলে শাহের মুখে এমন প্রশংসা শুনলে নিজেকে তার কদমে অর্পণ করে দিতো। কিন্তু গুলরুখ ছিলো অত্যন্ত সমঝদার একজন গায়িকা। সে মালিক শাহ'র স্তুতিবন্যার কারণ ধরে ফেলে। তার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য বুঝে ফেলে। এদিকে আসরের সবাই নিশ্চুপ। সবাই অপেক্ষা করে গুলরুখের উত্তরের।

এক দণ্ড সময় নিয়ে গুলরুখ মুখ খোলে। সে এমন এক উত্তর দেয় যে, উপস্থিত সবাই থ মেরে যায়। গুলরুখ বললো, আমার যেই রূপ ও সৌন্দর্য আপনার ভালো লেগেছে, আপনাকে মুগ্ধ করেছে, তার স্রষ্টা হলেন বিশ্বজগতের স্রষ্টা। তার চোখ নেই, তবু তিনি সব কিছু

দেখেন। তার কান নেই, তবু তিনি সব কিছু শোনেন। সুতরাং আমি তারই প্রশংসা করছি, যিনি আমাকে এমন সব নেয়ামত দান করেছেন, যার কারণে আপনার মত মহান সুলতান আমার প্রশংসা করেছেন।
আসরে উপস্থিত সকলে এমন উত্তরে থ মেরে যায়। সবাই পরস্পরের দিকে তাকায়। গুলরুখের উত্তর ছিলো অকল্পনীয়। উত্তরটি মালিক শাহ'র জন্য ছিলো শিক্ষনীয়। এতে তার জন্য ভাবনার অনেক বিষয়ই ছিলো। বিষয়টি যে সে বোঝেনি, তাও নয়। কিন্তু তার ভেতরে পশুত্বভাব বাঁধনহারা হয়ে পড়েছিলো। সে গুলরুখের উত্তর শুনেও না শোনার ভান করে। সে একই আবেদনে বলতে থাকে, শাহরুখ! তুমি তোমার সুরের লহরীতে আমার শাহি মেজাজকে বিনোদিত করেছো। আমি তোমাকে শাহি মেহমানদারি দ্বারা ভূষিত করতে চাই। আশা করি তুমি আমার শাহি খিমায় মেহমানদারি করার সুযোগ দিবে।
মালিক শাহ'র কথা গুলরুখের চেহরা নিমিষে বিবর্ণ হয়ে যায়। সে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলিয়ে বলে, সুলতানে মুয়াজ্জাম! কানিজ আপনার প্রজা। কিন্তু অধম কখনোই এটা পছন্দ করবে না যে, তার রূপ-যৌবন মহামান্য সুলতানের জন্য জাহান্নামের ইন্ধন হোক। মহামান্য সুলতান! হালাল ও হারামের মাঝে সামান্য একটুখানি তফাত, যা দূর করার ক্ষমতা মহামান্য সুলতানের হাতে রয়েছে।
সুলতানের কলিজায় তীর হয়ে বিদ্ধ হয় গুলরুখের উত্তর। উপস্থিতজনরা তো ভেবেই নেয় গুলরুখ চরম স্পর্ধা দেখিয়েছে। চূড়ন্ত শাস্তিই হবে গুলরুখের ভাগ্য লিখন। অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকে গুলরুখের মস্তক বিচ্ছিন্ন হওয়ার। কিন্তু সবাই দেখল ভিন্ন এক দৃশ্য। সবাই অবাক।
সুলতান মালিক শাহ এক দণ্ড থামলেন। ভাবনার সাগরে ডুব দিলেন। পর মুহূর্তে অত্যন্ত নরম সুরে বললেন, শাহরুখ! তুমি বড় সত্য কথা বলেছ। সত্যি তুমি বড় বুদ্ধিমতি। তোমার বুদ্ধিমত্তাকে আমি মোবারকবাদ জানাচ্ছি।
এরপর মালিক শাহ কাজি সাহেবকে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। কাজি সাহেব নৃত্য-গীতের ওই আসরেই গুলরুখ ও মালিক শাহ'র আকদ সম্পন্ন করলেন। এরপর মালিক শাহ'র জৌলসদার খিমাকে আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হলো। আলো ঝলমলে বাসরঘরে গুলরুখ যখন প্রবেশ করলো, রাত তখন তৃতীয় প্রহরে।
এই বিয়েতে সবচেয়ে বেশি খুশি হয় মালিক শাহ'র ওফাদার গোলামরা। মালিকা তুরকান খাতুনের বাড়াবাড়িতে তারা ছিলো অতিষ্ঠ। তুরকান খাতুনের এই বাড়াবাড়ি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার তাদের একদম অপছন্দ ছিলো। এই বিয়ে তাদের মনে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দেয়।
অন্যদিকে মালিক শাহ'র যেসব আমির-উজির এবং গোলামরা তুরকান খাতুনের উচ্ছিষ্টভোগী ছিলো এবং তার পক্ষ হয়ে কাজ করতো, এই বিয়ে তাদের মাথায় বজ্রপাত ঘটায়। তারা গভীর দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় যে, মালিকা তুরকান খাতুনকে তারা কী উত্তর দিবে। কতিপয় আমির পরামর্শ করে সঙ্গে সঙ্গে এক দূতকে পাঠিয়ে দেয় মালিকা তুরকান খাতুনের কাছে। সঙ্গে লিখে দেয় এই বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার প্রেক্ষাপট এবং তাদের অসহায়ত্বের বিবরণ।
দূতের মুখে বিয়ের কথা শোনামাত্র মালিকা তুরকান খাতুন ক্রোধে ফেটে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে সে বাগদাদ থেকে মালিক শাহ'র উদ্দেশে রওনা দেয়।
সেখানে পৌছার পর নববধূর সুসজ্জিত খিমার দৃশ্য দেখে মালিকা তুরকান খাতুনের কলিজা শুকিয়ে যায়। মেজাজ চরমভাবে বিগড়ে যায়। কিন্তু মালিকার শুভাকাঙ্ক্ষী আমিরগণ তাকে ধৈর্যধারণ এবং কৌশল অবলম্বনের নির্দেশ দেয়।
স্রষ্টার খেলা বোঝা বড়ই কঠিন। সত্য হল স্রষ্টা মানুষকে তার অনেক অপকর্মের স্বাদ দুনিয়ার বুকেই আস্বাদন করিয়ে থাকেন। স্রষ্টা কখন কাকে কিভাবে সেই স্বাদ আস্বাদন করাবেন, তা নগন্য সৃষ্টি বুঝবে কী করে!
নববধূর সুসজ্জিত খিমা তুরকান খাতুনের কষ্টের একমাত্র কারণ ছিলো না। মালিকা তুরকান ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছে, তুরকান খাতুনের রাজত্ব চিরতরে শেষ হয়ে গিয়েছে। কুদরত এখন তার জীবনের সকল অন্যায়-অনাচার এবং কুকর্ম ও অপকর্মের প্রতিশোধন নিবেন। তাকে ঠাই নিতে হবে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। অনাগত দুর্দিনের বিভিষীকা তুরকান খাতুনের বুকে শেল হয়ে বিঁধছিলো।

* * *

খলিফাকে দেয়া দশ দিনের অবকাশ এখনো শেষ হয়নি। ইতিমধ্যে সুলতান মালিক শাহ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনর্গল রক্তবমি এবং দাস্ত হচ্ছিলো। কোনোভাবেই তা বন্ধ হচ্ছিল না। মালিকা তুরকান খাতুন তাকে বাগদাদে ফিরে নিয়ে আসেন। বাগদাদের বড় বড় চিকিৎসকরা তার চিকিৎসা শুরু করে। খলিফা মুক্তাদি, খলিফাজননী এবং খলিফার বেগমগণ সুলতানকে দেখতে আসেন। কয়েকদিন চিকিৎসা চলার পরও মালিক শাহ'র কোনো উন্নতি হচ্ছিলো না। দাস্ত-বমি বন্ধ হচ্ছিলো না।
অবশেষে ৪৮৫ হিজরির শাওয়াল মাসের ৬ তারিখে সুলতান মালিক শাহ বিশ বছর রাজত্ব করার পর আটত্রিশ বছর বয়সে ইস্পাহান থেকে বহুক্রোশ দূর বাগদাদে ইনতেকাল করেন।
যে সুলতান খলিফাতুল মুসলিমিন মুক্তাদিকে দশ দিনের অবকাশ দিয়েছিলো, মৃত্যুর হাত থেকে সে নিজে দশ দিনের অবকাশ পেল না। ক্ষমতার দম্ভে মানুষ যে শিখড়েই পৌঁছুক, কুদরতের খেলা তাকে চরমভাবে শিক্ষা দেয়। আকাশ থেকে নামিয়ে ভূতলে আছড়ে ফেলে। আফসোস, তারপরও যদি আমরা মানুষ এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতাম!
ইতিহাসের এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষণীয়। বাস্তবতা হলো মালিক শাহ'র মৃত্যু স্বাভাবিক কোনো রোগবালাইয়ে হয়নি। হাসান বিন সাবাহ'র ফিরকায়ে হাশিশিয়ার যেই ফিদায়ি সদস্য নিজামুল মুলককে খঞ্জর মেরে হত্যা করেছিলো, সেই ফিদায়ি সদস্যই মালিক শাহ'র খাবারে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করে। নিজামুল মুলকের কথায় মালিক শাহ হাসান বিন সাবাহকে শাহি দরবার থেকে বের করে দিয়েছিলো। এর প্রতিশোধ নিতেই সে একজনকে খঞ্জর মেরে আর আরেকজনকে বিষ মিশিয়ে হত্যা করে।
যে রাতে মালিক শাহ ইনতেকাল করেন, সে মুহূর্তে তার কামরায় নতুন উজির তাজুল মুলক, আমির মাসতাওফি এবং আমির আবুল মুআলি উপ্থিত ছিলো। এরা সবাই মালিকা তুরকান খাতুনের উচ্ছিষ্টভোগী ওফাদার ছিল। তাজুল মুলককে তো মালিকাই উজিরে আজম বানিয়েছিলো। মালিকা তুরকান খাতুন পাশের কামরাতেই উপিস্থিত ছিলো। তাজুল মুলকের হাত ছিলো মালিক শাহ'র হাতের নাড়ীতে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

আপনার স্বপ্ন আমাদের ব্যাখ্যা

আমরা অনেক কিছুই স্বপ্নে দেখি। সেই স্বপ্নের তাৎপর্য জানার জন্য উদগ্রীবও হয়ে থাকি। নানা জনের কাছে বলে বেড়াই, জানতে চাই– এর ব্যাখ্যা কী?
আপনার জন্য সতর্ক বার্তা– স্বপ্ন যে কাউকে বলবেন না। কেউ যদি আপনার স্বপ্ন না বুঝে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বসে, আপনার ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে। তবে অভিজ্ঞ, হিতৈষী আলেম হলে বিপদের শংকা নেই। মাসিক মহিলাকণ্ঠে ইনশাআল্লাহ নিয়মিত থাকছে আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। তাই কোন স্বপ্ন নিয়ে কৌতুহল থাকলে পূর্বের পৃষ্ঠার ফরমটি পূরণ করে আজই লিখুন আমাদের কাছে। আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলবেন গবেষক আলেম, মনস্তত্ত্ববিদ মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন।
প্রদত্ত ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট স্বপ্নদ্রষ্টার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্য কারো বেলায় প্রযোজ্য নাও হতে পারে।
–সম্পাদক



সামসুদ্দিন সাদী, ভোলা
স্বপ্ন : স্বপ্নে দেখি, আমরা কয়েক বন্ধু মিলে কোথাও গিয়েছি। গভীর রাত। আকাশে অনেকগুলো ফাইটার প্লেন। প্লেনগুলো দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। ভয়ে দৌড়ে গিয়ে খড়ের ভেতর লুকালাম। এমন সময় একটি ফাইটার প্লেন আমার সামনে এসে নামলো। আমাদের ধরে প্লেনে উঠিয়ে নিলো। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।
ব্যাখ্যা : আপনি স্বপ্নে দেখার সময় আবহাওয়া কেমন ছিলো সে তথ্য আমার সামনে অনুপস্থিত। সম্ভবত তখন আকাশে মেঘের গর্জন বা বজ্রধ্বনি হচ্ছিলো। সে আওয়াজই অবচেতন মনে ফাইটারের আওয়াজ বলে অনুভূত হয়েছে এবং এমন স্বপ্ন দাঁড় হয়েছে।

রফিকুল আলম, ফরিদাবাদ মাদরাসা, ঢাকা
স্বপ্ন : স্বপ্ন দেখলাম, আমি এক মাদরাসায় ভর্তি হয়েছি। অনেক ছাত্র। আমি হুজুরের কাছে সুরা আর রহমান মুখস্ত করে সুরা ফাতিহা মুখস্ত করতে শুরু করেছি। এক পর্যায়ে একটি আয়াত পড়তে পড়তে ঘুম ভেঙ্গে যায়।
ব্যাখ্যা : আলহামদুলিল্লাহ, কল্যাণ ও মঙ্গলের ইঙ্গিতবহ স্বপ্ন। সাধারণত স্বপ্নে সুরা আর রহমান তিলাওয়াত রহমতের ইঙ্গিতবহ। একইভাবে সুরা ফাতেহা তিলাওয়াতও মঙ্গল ও কল্যাণবহ হয়ে থাকে।

আবু জাহান, মনোহরদী, নরসিংদী
স্বপ্ন : ফজর পড়ে ঘুমিয়েছি। স্বপ্ন দেখি, আমার পাঁচ বছর বয়সি ছেলেটে রোজা রেখেছে। দিন শেষে ইফতার করতে বসেছি। আমার ছেলে ইফফাত তাহসিনও ইফতার করতে বসেছে। সে দোয়া পড়তে পড়তে আমাকে বলছে, আমি সারা রমজানই রোজা রাখবো। কী দেখলাম, বিস্তারিত জানালে খুশি হব।
ব্যাখ্যা : নাবালেগ সন্তানদের মধ্যে যাদের দ্বারা রোজা রাখানো সম্ভব তাদেরকে রোজা রাখাতে হয়। এটাই শরিয়তের মাসআলা। নাবালেগ বলেই একবাক্যে তাদেরকে অক্ষম মনে করে ছাড় দিতে নেই। রমজানের প্রায় মাসখানেক পূর্বে এ স্বপ্ন দেখিয়ে আপনাকে এ মাসআলাটির ব্যাপারে সম্ভবত সর্তক করা হয়েছে।

উসমান আফফান, ভালুকা, ময়মনসিংহ
স্বপ্ন : স্বপ্ন দেখলাম, কেউ একজন আমাকে অনেক মুরগির বাচ্চা পালতে দিয়েছে। বাচ্চাগুলো পালতে পালতে বড় হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ করেই কী হলো, সেগুলো এক এক করে মরতে শুরু করলো। এমন সময় দুশ্চিন্তা নিয়ে আমার ঘুম ভাঙলো।
ব্যাখ্যা : আপনার স্বপ্নের বহুমুখী ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বপ্নবিষয়ক সংশ্লিষ্ট ফরম পূরণ না করে দেয়ায় প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে স্বপ্নটির ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হলো না। অন্তত মোবাইল নম্বর থাকলেও আমরা যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিতে পারতাম।

মাহকুমা বেগম, ঘাটের চর, পিরোজপুর
স্বপ্ন : মাঝে মধ্যেই স্বপ্নে দেখি এই আয়াত পাঠ করছি– মিনহা খলাকনা কুম...। এটা পড়তে পড়তে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। এর মানে কী!
ব্যাখ্যা : মিনহা খলাক্বনাকুম... আয়াতে মানুষের সৃষ্টির মূল উপাদান এবং মানুষের জীবনের পরিণতি, কবর জগতে যাওয়া ও আখেরাতে পুনরুত্থিত হওয়ার আলোচনা রয়েছে। স্বপ্নে এই আয়াত তিলাওয়াত করতে দেখা মানুষের পরিণতির কথা চিন্তা করে ঈমান আমলের ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার ইঙ্গিত বুঝায়।

প্রশ্নোত্তর

আপনার জিজ্ঞাসার জবাব



প্রশ্ন : আমি শুনেছি কেউ রোজা রেখে ইচ্ছাকৃত ভেঙ্গে ফেললে তার ওপর কাজা-কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হয়। আর ইচ্ছাকৃভাবে একেবারেই না রাখলে শুধু কাজা করতে হয়। কথাটি কতটুকু সঠিক?

উত্তর : হ্যাঁ, আপনি যা শুনেছেন তা সঠিক। তবে যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা না রাখে সে ফাসেক ও তার জন্য দুনিয়াতেই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শাস্তির বিধান রয়েছে, পরকালের আজাব তো রয়েছেই।

সূত্র : রদ্দুল মুহতার ৩/৩৪৯ আন নাহরুল ফায়েক ১/২১ হাশিয়ায়ে ত্বাহতবি আলাল মারাকি পৃ. ৬৬৩

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী ৯ মাসের অন্তসত্ত্বা। ভালভাবে নড়াচড়া, খাওয়া দাওয়া করতে পারে না। যদি রোজা রাখে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। এমতাবস্থায় তার জন্য রোজা না রাখার অবকাশ রয়েছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, যদি আপনার স্ত্রীর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে তার জন্য রোজা না রাখার অবকাশ রয়েছে। তবে পরবর্তীতে অবশ্যই কাজা করে নিতে হবে।

সূত্র : ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১০৭, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৬৫, তানবিরুল আবছার মায়ার রদ্দ ৩/৪০৩

প্রশ্ন : রোজা অবস্থায় অনেকেই টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করে, অনেকে কালো নিমের মাজন দিয়ে দাঁত মাজে, অনেকেই দাঁতে গুল দিয়ে থাকে। এসব দ্বারা কি রোজার কোনো ক্ষতি হয়?

উত্তর : উল্লিখিত টুথপেস্ট, মাজন, গুল ইত্যাদি মুখে দেয়ার দ্বারা তা যেহেতু গলার ভিতরে প্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে তাই রোজা অবস্থায় এসব ব্যবহার করা মাকরুহ। আর যদি এসবের সামান্যও গলায় ভিতরে ঢুকে যায় তাহলে রোজা ভেঙে যাবে। তাই দাঁত পরিষ্কারের প্রয়োজন হলে গাছের ডাল বা টুথপেস্ট ছাড়া ব্রাশ দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা যেতে পারে। কাঁচা ডাল দ্বারা মেসওয়াক করার সময় তার তিক্ততা গলায় অনুভব হলেও রোজার কোনোরূপ ক্ষতি হবে না।

সূত্র : ফাতাওয়া খানিয়া ১/২০৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৯ ফাতহুল কাদীর ২/২৪৯

প্রশ্ন : একজন মহিলার নিয়ম অনুযায়ী প্রতিমাসের ৫, ৬ তারিখে ঋতুস্রাব আসে। তাই সেই দিনগুলোর রাখতে হয় না এবং সেই দিনগুলিতে স্বামীর সাথে সহবাস করতে পারে না। ওই মহিলা যদি ঔষধ সেবনের মাধ্যমে কোনো মাসে ঋতুস্রাব বন্ধ রাখে সেই মাসে উক্ত দিনে রমজানের রোজা রাখা তার জন্য আবশ্যক কি? এবং সেই দিন গুলিতে তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে কি?

উত্তর : যদি কোনো মহিলা রমজানে ঔষধ সেবনের মাধ্যমে ঋতুস্রাব বন্ধ রাখে তাহলে তার ঋতুস্রাবের তারিখগুলোতে রোজা রাখতে হবে এবং উক্ত দিনগুলোতে রাতের বেলা স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে। তবে এ ধরনের ঔষধ সেবনে ক্ষতির আশংকা থাকলে তা ব্যবহার না করাই ভাল।

সূত্র : নুরুল ইজাাহ পৃ. ১২৫ জামিউল ফাতাওয়া ৫/৩১৭, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/১৫৮

প্রশ্ন : আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। একদিন রমজানের রোজা অবস্থায় বাথরুমে গোসল করতে গিয়ে হস্তমৈথুন করে বীর্যপাত করি। এতে কি আমার রোজা ভেঙ্গে গিয়েছে? আমার ওপর কাজা কাফফারা উভয়টিই ওয়াজিব?

উত্তর : হ্যাঁ হস্তমৈথুনের কারণের আপনার রোজা ভেঙ্গে গিয়েছে এবং কাজা-কাফফারা উভয়টিই ওয়াজিব।

সূত্র : রদ্দুল মুহতার ৩/৩৭১ আলবাহরুর রায়েক ২/৪৭৫, ফাতাওয়া তাতারখানীয়া ২/১০৬

প্রশ্ন : রোজা অবস্থায় গ্লোকোজ ইঞ্জেকশন বা অন্য কোন ইঞ্জেকশন গ্রহণ করা যাবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ রোজা অবস্থায় ইঞ্জেকশন গ্রহণ করলে রোজার কোনো ক্ষতি হয় না। তবে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া শুধু শরীরের দুর্বলতা কাটানোর জন্য ইঞ্জেকশন গ্রহণ করা উচিত নয়।

সূত্র : রদ্দুল মুহতার ৩/৩৬৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৩ আলবাহরুর রায়েক ২/৪৭৬

প্রশ্ন : শাসকষ্ট রোগীদের জন্য অনেক সময় ঔষধস্বরূপ ইনহেলার ব্যবহার করতে হয়। রমজানের দিনের বেলায় রোজা রেখে ইনহেলার ব্যবহার করলে রোজা ভেঙে যাবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, রোজা রেখে ইনহেলার ব্যবহার করলেও রোজা

ভেঙে যাবে। কেননা ইনহেলারের সাহায্যে ধোঁয়ার মত মানুষের ফুসফুসে গ্যাসের সাথে ঔষধ প্রবেশ করানো হয়। আর ধোয়া পানের দ্বারা মানুষের রোজা ভেঙে যায়।
সূত্র : রদ্দুল মুহতার ৩/৩৬৬, হাশীয়াতুত তাহাবী আলাল মারাকী পৃ. ৩৬১, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২/৬৫৭

প্রশ্ন : অনেক সময় রোজাদারের নাকে বা মুখে মশা মাছি ঢুকে যায়। এতে কি রোজা ভেঙে যাবে?
উত্তর : না রোজাদারের নাক বা মুখ দিয়ে মশা, মাছি ঢুকে পেটে চলে গেলেও রোজা ভাঙবে না।
সূত্র : ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৩, মাজমাউল আনহুর ১/৩৬১ হিদায়া ১/২১৮

প্রশ্ন : যাদের দাঁতে ব্যথা হয় তাদের দাঁত দিয়ে রক্ত আসে অনেক সময় সেই রক্ত থুথুর সাথে পেটে চলে যায়। এতে কি রোজাদারের রোজা ভেঙে যাবে?
উত্তর : দাঁত থেকে রক্ত আসাটা দু' রকমের হতে পারে।
১। রক্তের পরিমাণ থুথুর সমপরিমাণ বা বেশি হবে অথবা গলায় রক্তের স্বাদ অনুভব হবে এমন হলে তা গিলে ফেলার দ্বারা উক্ত রোজাদারের রোজা ভেঙে যাবে।
২। রক্তের পরিমাণ থুথুর চেয়ে কম হলে তা গিলে ফেলার দ্বারা রোজাদারের রোজা ভাঙবে না।
সূত্র : রদ্দুল মুহতার ৩/৩৬৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪৪৭ ফাতাওয়া দারুল উলুম ৬/৪১৪

প্রশ্ন : আমি গত বছর রমজানের শেষ দশদিন এতেকাফ করেছি। ২৫ রোজার দিন জ্বর আসার কারণে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। এরপর শেষ পর্যন্ত এতেকাফ পুরা করেছি। এতে কি আমার এতেকাফ হয়েছে? না হলে আমার দশ দিনের এতেকাফের কাজা করতে হবে কি?
উত্তর : না, অসুস্থতার কারণে হলেও ডাক্তারের কাছে যাওয়ায় আপনার এতেকাফ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে আপনাকে দশদিনের এতেকাফের কাজা করতে হবে না বরং রোজাসহ একদিনের এতেকাফের কাজা করতে হবে।
সূত্র : রদ্দুল মুহতার ৩/৩৮৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২১২, ফাতাওয়া উসমানী ২/১৯৫

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একজন লোককে এতেকাফে বসানো হয়েছে। সে একদিন অসুস্থতার কারণে রোজা রাখতে পারেনি। এতে কি তার এতেকাফ সহি হয়েছে?
উত্তর : না, তার সুন্নাতে এতেকাফ সহি হয়নি বরং তা নফল হয়ে গিয়েছে। আর যে দিন সে রোজা রাখেনি সেই দিনের এতেকাফটি তার কাজা করতে হবে। কাজা করার দিন রোজাও রাখতে হবে।
সূত্র : ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২১১ হাশিয়ায়ে তাহাবি আলাল মারাকি পৃ. ৭০০, রদ্দুল মুহতার ৩/৩৮৩

যোবায়ের, সিরাজগঞ্জ
প্রশ্ন : ঢাকায় মতিঝিলে একটি মসজিদে আমি একটি মসজিদে এতেকাফ করেছি। সেখানে এলাকার কেউই এতেকাফ করেনি। এতে কি এলাকা বাসীর ওপর থেকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদার হক আদায় হয়েছে। এবং আমার এতেকাফ আদায় হয়েছে?
উত্তর : হ্যাঁ কোন মসজিদে যে কেউ এতেকাত করলেই সেই মহল্লাবাসীর সুন্নাতে মুআক্কাদার দায়িত্ব পূর্ণ হয়ে যায়। তাই উক্ত মহল্লা বাসীর দায়িত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং আপনার এতেকাফ সহি হয়েছে। কিন্তু মহল্লাবাসীর জন্য অন্য এলাকার আপনাকে দিয়ে এতেকাফ করিয়ে এতেকাফের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিত হয়নি।
সূত্র : সূরা আলে ইমরান আয়াত : ১৩৩, রদ্দুল মুহতার ৩/৩৮১, আননাছরুল ফায়েক ২/৪৪

কিশোর কানন

ছোটদের জন্য মহিলাকণ্ঠের বিশেষ আয়োজন

সম্পাদকীয়

আমি প্রায়ই ভাবি, ঈদের দিনের কী এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে এ দিন আমরা সবাই হাসি খুশি থাকি, সবার সঙ্গে কুশল বিনিময় করি, মন খুলে কথা বলি, যার সাথে কখনো কথা হয় না তাকেও ইতস্তত করে বলে ফেলি– ঈদ মোবারক। এ দিনটি তো অন্যান্য দিনের মতোই। এদিনও সূর্য উঠে, রোদ হয়, বৃষ্টি ঝরে, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয় তারপর সন্ধ্যা। কই, অন্যান্য দিনের চেয়ে কোনো দিক দিয়েই তো আলাদা নয় দিনটি। তাহলে এ দিনটিতে কেন আমরা আলাদা হয়ে যাই, অন্য মানুষ হয়ে ওঠি?

ধর্মীয় কারণ তো একটা অবশ্যই আছে। আল্লাহ তায়ালা এ দিনটিকে ঈদ তথা আনন্দের দিন হিসেবে ঘোষণা করেছেন তাই এ দিনটিতে আমরা আনন্দে থাকি, ফূর্তিতে কাটাই।

আসলে পুরো ব্যাপারটাই মানসিক। আমরা ঈদের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে মনে বলি– আজ ঈদ, আজ কোনো নিরানন্দের বিষয় ঘটানো যাবে না। ব্যস এই... এই মন-প্রতিজ্ঞার কারণে সারাটা দিন আমরা লোক দেখানো হলেও হাসি-খুশি থাকি। আমরা যদি অন্যান্য দিনও এমন মন নিয়ে ঘুম থেকে উঠি তাহলে নিশ্চয় সেই দিনটাও আনন্দের হবে। অবশ্য সব দিন যদি ঈদের দিন হয়ে যায় তাহলে ঈদের কোনো মূল্য থাকবে না। সবাই ভালো থাকো। ঈদ মোবারক।

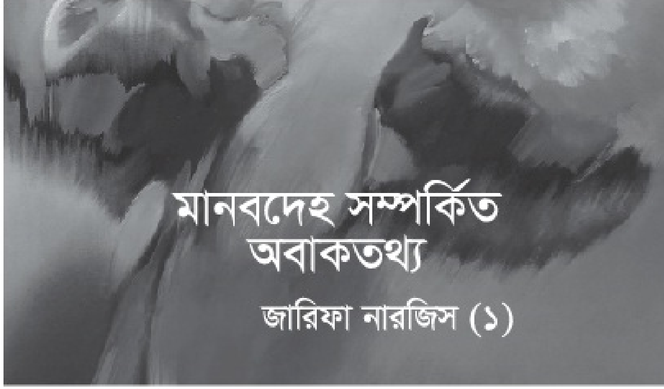
মানুষ চেনার উপায়

হাফেজ এমদাদুল্লাহ

হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে এক ব্যক্তি কারো প্রশংসা করলে তিনি তাকে বলেন, তুমি তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছো সে খুব ভালো লোক, তার স্বভাব চরিত্র অনেক ভালো। তার সঙ্গে কি তোমার কখনো কোনো টাকা-পয়সা বা অন্য কোনো লেনদেন হয়েছে? সে উত্তর বললো, না, তার সঙ্গে কখন লেনদেন হয়নি।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি তার সঙ্গে কখনো কোথাও সফর করেছো? সে বললো, না, তার সঙ্গে কখনো সফর করিনি।

হজরত ওমর রা. বললেন তাহলে তুমি কিভাবে জানবে তার স্বভাব চরিত্র কেমন? কারণ একজনের স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার তখনই জানা যায় যখন কেউ তার সঙ্গে কোনো লেনদেন করে এবং তাকে সৎ পায়। খনই বোঝা যায় সে লোক ভালো নাকি মন্দলোক। কারো চরিত্র জানার আরেকটি পদ্ধতি হলো তার সঙ্গে ভ্রমণ করা। কারণ ভ্রমণে মানুষ খেলামেলা এবং মুক্তমনে চলে। তখন তার স্বভাব-চরিত্র, উৎসাহ এবং চিন্তা-চেতনা সবকিছু প্রকাশ পায়। সুতরাং যদি তুমি তার সঙ্গে কোনো লেনদেন করতে অথবা তার সঙ্গে কোথাও ভ্রমণে যেতে তাহলে তোমার এ কথা সত্য প্রমাণিত হতো। কিন্তু তুমি তার সঙ্গে কোনো লেনদেন বা ভ্রমণ কিছুই করোনি তাহলে বোঝা গেলো তুমি তার ব্যাপারে কিছুই জানো না। কাজেই তার ব্যাপারে চুপ থাকো। তার ভালো বা মন্দ কিছুই বলার প্রয়োজন নেই। যদি তোমাকে কেউ তার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করে তাহলে তুমি ওই পর্যন্ত বলো যা তোমার জানা আছে।



মানবদেহ সম্পর্কিত অবাকতথ্য

জারিফা নারজিস (১)

অনেক আজব মানুষের শরীর। পা থেকে মাথা পর্যন্ত এম অনেক কিছু আছে যা জেনে সত্যিই অবাক হতে হয়। চলুন জেনে নিই মানুষের শরীর সম্পর্কিত কিছু তথ্য।

* পুরুষের থেকে নারী চুল বেশি হারায়। প্রতিদিন পুরুষ হারায় ৪০টা চুল আর নারী হারায় ৭০টা চুল।
* মানুষের শরীরের রয়েছে প্রচুর পরিমাণে লবণ। মানুষের শরীরের রক্তে লবণের পরিমাণ একটা সাগরে থাকা লবণের সমান।
* মানুষ রাতের থেকে সকালে তুলনামূলক বেশি লম্বা হয়।
* মানুষের শরীরের হৃদপিণ্ডের প্রতিদিনের গড় রক্ত সঞ্চালনের পরিমাণ ১০০০ বার।
* আমাদের চোখের পাপড়ির আয়ুকাল মাত্র ১৫০ দিন।
* মানুষের চোখের ভ্রুতে চুলের পরিমাণ প্রায় ৫০০-এর মতো।
* একজন মানুষের শরীরে গড় নার্ভের পরিমাণ গড়ে প্রায় একশো বিলিয়ন।
* মানুষ চোখ খোলা রেখে কখনোই হাঁচি দিতে পারে না।
* একজন মানুষের শরীরে হাড় জমাটবাঁধা কংক্রিটের চেয়েও বেশি শক্ত।
* আমাদের জিহ্বা স্বাদের তারতম্য প্রতি দশ দিন পরপর নষ্ট হতে থাকে।
* বাচ্চাদের জন্য বসন্তকালটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তারা বসন্তকালীন সময়ে সবচেয়ে বেশি বেড়ে ওঠে।
* মানুষের চোখ সারা জীবন একই আকারের থাকে কিন্তু নাক এবং কান একইভাবে বেড়ে উঠে।
* মানুষ জন্মানোর সময় ৩০০টি হাড় নিয়ে জন্মায় এবং যখন পূর্ণবয়স্ক হয় তখন আমাদের হাড় হয়ে যায় ২০৬টা।
* মানুষের মাথার খুলি ভিন্ন রকমের ২৬টি হাড় দিয়ে তৈরি।
* হাতের নখের মত পদার্থ দিয়েই তৈরি হয়েছে চুল।
* জেনে অবাক হবেন, আমাদের শরীরের ভেতরের সমস্ত যন্ত্রাংশ কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় যখন আমরা হাঁচি দেই। এমনকি আমাদের হৃদপিণ্ডও।
* জিহ্বা শুধু স্বাদ গ্রহণ আর উচ্চারণে নয়, জিহ্বা মানুষের শরীরের সব চেয়ে শক্তিশালী একটি পেশী।
* স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ দৈনিক ছয়বার বাথরুমে যায়।
* জেনে অবাক হবেন, মানুষের মুখ থেকে পেটে খাবার যেতে সময় লাগে মাত্র ৭ সেকেন্ড।
* হাঁচির সময় মানুষের নাক দিয়ে বাতাস বের হয় ১০০ কিলোমিটার বেগে।
* পরীক্ষা করে দেখেতে পারেন, আপনি যে পেশীর উপর বসে থাকেন সেটিই আপনার শরীরের সবচেয়ে বড় পেশী।
* মানুষের দেহের সবচেয়ে ছোট হাড় হলো কানের হাড়।

বিভিন্ন রক্তের গ্রুপের বৈশিষ্ট্য

সংগ্রহে : ফাতেমা আমাতুল্লাহ (২)

O+: এই ব্লাড-গ্রুপের মানুষেরা স্বচ্ছ দৃষ্টি-সম্পন্ন, গভীর মনোযোগী, উচ্চাকাঙ্খী, স্বাস্থ্যবান, বাকপটু, বাস্তববাদী, রোমান্টিক এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয়ে থাকে।

O-: এই ব্লাড-গ্রুপের মানুষেরা সাধারণত অন্যের মতামতকে গ্রাহ্য করে না। এরা সমাজে মর্যাদা বাড়াতে আগ্রহী, বড়লোকের সঙ্গপ্রিয় এবং বড় বেশি বাচাল।

A+: এই ব্লাড-গ্রুপের মানুষেরা গোছগাছ-প্রিয়, দক্ষ চাকুরে এবং খুঁতখুঁতে স্বভাবের হয়ে থাকে। এরা আত্মকেন্দ্রিক, সুবিচারক, শান্ত, বিশ্বস্ত, নিয়মানুবর্তী ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

A-: এই ব্লাড-গ্রুপের মানুষেরা খুব খুঁতখুঁতে স্বভাবের এবং কিছুটা অমনোযোগী, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে বেশি মনোযোগী। এদের অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার প্রবণতা বেশি। এদের আছে নিজেকে লুকানোর অভ্যাস ও একঘেয়ে জীবন।

B+: এই ব্লাড-গ্রুপের মানুষেরা স্বাধীনচেতা, মেধাবী, নমনীয়, মনোযোগী, স্বাস্থ্যবান, সরল, দক্ষ, পরিকল্পনাবাদী, বাস্তববাদী, আবেগপ্রবণ এবং খুব বেশি রোমান্টিক হয়ে থাকে।

B-: এই ব্লাড-গ্রুপের মানুষেরা অসংযমী, অপরিণামদর্শী, দায়িত্বহীন, অলস, স্বার্থপর, অগোছালো, অবিবেচক ও স্বার্থান্বেষী হয়ে থাকে।

AB+: এই ব্লাড-গ্রুপের মানুষেরা সাধারণত সুবিবেচক, বুদ্ধিসম্পন্ন, হিসেবি, পরিকল্পনাবাদী, সৎকৌশলী, সংবেদনশীল, নিরেট এবং খুব চমৎকার সাংগঠনিক হয়ে থাকে।

AB-: এই ব্লাড-গ্রুপের মানুষেরা দুর্বোধ্য, ক্ষমতাহীন, অন্যকে আঘাত করতে আগ্রহী, স্বল্প এনার্জির, খুব বেশি রক্ষণশীল ও বড় বেশি সংবেদনশীল হয়ে থাকে।

সূত্র: ৯০ এর দশকের মাঝামাঝিতে প্রকাশিত 'You and your Blood type' গ্রন্থ।



বাকহীন

আবিদা সুলতানা আঁখি

এখন জ্যৈষ্ঠ মাস। ঘনঘন বৃষ্টির উৎপাত। বিকেল না নামতেই আজ যেন কালো মেঘটা ঢেকে ফেলেছে নীল আকাশকে, সাথে সাথে নিপার মনটাকেও। রান্নাঘরের উপরে ছনের বেড়া, চারপাশে ফাঁকা। মাঝখানে বসে ভাতের চুলায় লাকড়ি দিতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়া শুরু হলো। এখন রোজার মাস, সামনেই ঈদ। কথাটা ভাবতেই যেন নিপার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এলো। চোখের জল গড়িয়ে নামলো থুতনির নিচ পর্যন্ত।

নিপা মুখ উঁচু করে দেখলো তার কান্না উপভোগ করছে অদূরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা শিউলী। প্রায়দিনই সে মায়ের চোখের জলকে শান্ত চেহারায় দেখে। আজকেও ব্যতিক্রম হয়নি। হাতের ইশারায় ডাকতেই দৌড়ে এলো শিউলী মায়ের কাছে।

শিউলীর বয়স পাঁচ বছর। ওর বাবার নাম ছিলো শফিক। বাবার নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখা শিউলী। কিন্তু বাবা আজ নেই। শিউলী তখনো নিপার গর্ভে। গাড়ি একসিডেন্টে পা কাটা যায় শফিকের। আর সেখান থেকেই ক্যানসার, অতঃপর দেহত্যাগ।

ঈদের ঠিক তিনদিন আগে এ দুর্ঘটনা ঘটে আর ঈদের দিন সকালে শিউলীর জন্ম।

নিপা স্বামী-সংসার হারানোর পরও সন্তানকে নিয়ে বেশ সুখেই ছিলো, মা ডাক শোনার অপেক্ষায়। কিন্তু নিপার দুর্ভাগ্য- শিউলী কথা বলতে পারে না। ইদানীং নিপার সমস্ত কষ্টের মাঝে এই কষ্টটা বড্ড বেশি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছে। এই যে ঈদ প্রায় এসে গেছে, শিউলী কিছুই বলতে পারে না। তার কী চাই, কী তার পছন্দ, ঈদে কী খাবে- সে কিছুই বলে না। হয়তো বলে নিজের ভাষায় কিন্তু নিপা সবটুকু বুঝে নিতে সক্ষম হয় না। একটা জিনিস পছন্দ না হওয়া একরকম কষ্ট আর একেবারে না পাওয়া অন্যরকম কষ্ট।

নিপা অন্যের বাসায় কাজ করে যা পায় তাতে মাস চালানো বড় দায় হয়ে যায়। তা থেকে আবার সন্তানের চাহিদা পূরণ আর নিজেরটা তো প্রশ্নই ওঠে না। এজন্য ঈদ এলেই যেন নিপার মনের অশান্তি আরো বেড়ে যায়। ঈদ মানেই খুশি ঈদ মানেই আনন্দ; কিন্তু নিপার এই ঈদের আনন্দটা যেন পাঁচ বছর আগে চলে গেছে। এখন তার দিন কাটে কেবল একটু খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার।

আসুন, আমরা সবাই মিলে খোঁজ নিয়ে দেখি, হয়তো আমাদের আশেপাশেই রয়েছে হাজারো শিউলী। যারা অন্ধকারে থাকতে থাকতে আলোর মুখ কখনো দেখে না। আমরা যদি আমাদের সাহায্যের হাত একটু বাড়িয়ে দেই তাহলে হাজার শিউলী দেখতে পারে আলোর পথ। আপনার একটুখানি সাহায্য হাজার শিউলীর জীবন না হোক একজন শিউলীর জীবনকে আলোকিত করুক। হাজার দিন না হোক একটি দিন সুখ বয়ে আনতে পারে অবশ্যই।

পর্দা : কেন বিব্রত হতে হয়

কাজী মাহবুবা সুলতানা (সাঈদা)

পর্দা আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ নির্দেশ। নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য পর্দা ফরজ। পর্দার সুফল ইহকাল ও পরকালে পাওয়া যাবে। পর্দার কারণে ইহকালে ইজ্জত-আব্রুর হেফাজত, নিরাপত্তা, সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা লাভ হয়। আর পরকালে এর প্রতিদানস্বরূপ মহান আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত নেয়ামত ও জান্নাত পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে, বেপর্দার জন্য ইহকালে বেইজ্জতি, সম্ভ্রমহানী ও পরকালে জাহান্নামে বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিভোগ করতে হবে।

এইতো সেদিনের কথা। আমাদের এসএসসি পরীক্ষা চলছে। আমাদের হলরুমে দুটো মেয়ে বাদে সবাই বোরকা পরে। প্রথম পরীক্ষার দিন রুমে গার্ডে এলেন একজন হিন্দু ম্যাডাম ও দু'জন পুরুষ স্যার। স্যার দু'জন মুসলমান। ম্যাডাম এডমিট ও রেজিস্ট্রেশন কার্ডের সাথে সবার চেহারা মেলানোর জন্য যারা বোরকাপরা তাদের নেকাব খুলতে বললেন। অনেকেই নেকাব সরালো। কেউ কেউ ইতস্ততঃবোধ করছিল কিন্তু ম্যাডামের কর্কষ সুরের ধমক শুনে নেকাব সরাতে বাধ্য হলো। কিন্তু আমাকে বাধ সাধতে হলো। এতো ছেলেদের সামনে চেহারা দেখাবো! অসম্ভব মনে হলো। বললাম, ম্যাডাম আমি ঠিক আছি, চেহারা মেলাতে হবে না, সমস্যা নেই।

তিনি বললেন, না, তোমার চেহারা দেখাতে হবে। মুখে সমস্যা কী?

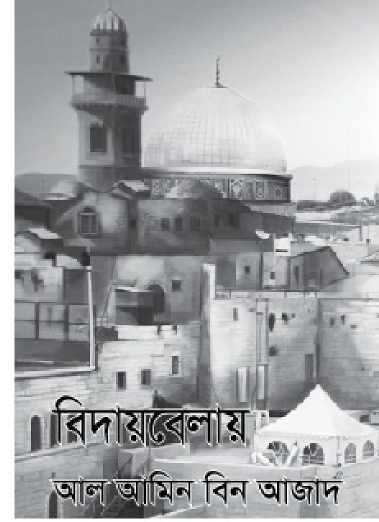
পাশের মেয়েরা বললো, ম্যাডাম, এখানে তো ছেলেরা তাই ও ওদের সামনে মুখ খুলবে না। কে শোনে কার কথা! ম্যাডাম রেগে বললেন, না খুললে চলে যা! তোর পরীক্ষা দিতে হবে না। ওরা তোর চেহারা দেখলে কী হবে? চেহারা খুব বেশি হয়েছে নাকি? তাহলে পরীক্ষা না দিলেই হয়!

আরো যাচ্ছেতাই। তবুও বললাম, ম্যাডাম, বারান্দায় চলেন ওখানে কেউ নেই। তবুও শুনলো না। নিরুপায় হয়ে সবাই যখন পরীক্ষার লেখা নিয়ে ব্যাস্ত তখন নেকাব খুললাম আর ম্যাডাম খুঁটেখুঁটে এডমিটের চেহারার সাথে আমার চোহারা মেলালেন। সে কী বিব্রতকর পরিস্থিতি!

প্রকৃত দাতা

মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন (৩৩১)

হজরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে বলা হয় পঞ্চম খলিফা। ন্যায়পরায়ণতার কারণে আজও তিনি ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন। খোলাফায়ে রাশেদিনের পরেই তাঁর মর্যাদা।
তাঁর দানের হাত ছিলো অনেক প্রশস্ত। কোনো সাহায্যপ্রার্থী তার শরণাপন্ন হলে তিনি তাকে নিরাশ করতেন না। সকলকে কিছু না কিছু দান করতেন।
একদিন এক ভিক্ষুক চিন্তা করলো, যখন কেউ থাকবে না তখন আমি তার কাছে গিয়ে কিছু চাইবো। তাহলে আমি বেশি পাবো। কারণ, সে সময় আমি একাই সাহায্যপ্রার্থী হবো। অন্য কেউ তার কাছে ভিড় করবে না। তাই তিনি আমাকেই দিয়ে দিবেন তার দানের এক মোটা অংশ। এই চিন্তা করে সে রাতের শেষভাগকে বেছে নিলো তার উদ্দেশ্য অর্জনের উপযুক্ত সময় হিসেবে।
ভিক্ষুক নির্ধারিত সময়ে রওনা হলো খলিফার বাসভবনের উদ্দেশে। বাসভবন বেশি দূরে ছিলো না। সে দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লো। ভেতর থেকে আওয়াজ ভেসে এলো, কে? নিজের পরিচয় দিয়ে ভিক্ষুক বললো, আমি খলিফার সাক্ষাতপ্রার্থী।
ভেতর থেকে উত্তর এলো, তিনি মসজিদে।
ভিক্ষুক আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়লো মসজিদের উদ্দেশে। সেখানে পৌছে দেখতে পেলো, এক ব্যক্তি অঝোরে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করছে– হে প্রভু, তুমি আমাকে দান করো। দূর-দূরান্ত থেকে বহু সাহায্যপ্রার্থী আসে আমার কাছে। তুমি যদি আমাকে দান না করো তাহলে আমি তাদেরকে কোত্থেকে দান করবো?
ভিক্ষুক লোকটিকে দেখেই চিনতে পারলো। আরে, এ তো স্বয়ং আমিরুল মোমিনিন ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ! আমি এমন ব্যক্তির কাছে সাহায্য নিতে এসেছি যে কিনা নিজেই ভিক্ষুক। সে তখন প্রতিজ্ঞা করলো, আর কখনো কোনো মানুষের কাছে চাইবো না। মানুষের দুয়ারে দুয়ারে আর হাত পাতবো না। চাইবো তার কাছে যার কাছে চায় খলিফাও। সে আর দেরি না করে সেখান থেকে ফিরে আসতে লাগলো, নতুন এক শিক্ষা নিয়ে।
এরই মাঝে খলিফার মোনাজাতও শেষ হয়ে গেলো। হঠাৎ তিনি কারো পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন। খলিফা প্রশ্ন করলেন, কে?
: আমি ভিক্ষুক।
: কাকে খুঁজছো?
: খলিফাকে।
: কেন?
: কিছু সাহায্য চাইতে।
: এখন কোথায় যাচ্ছো?
: চলে যাচ্ছি।
: কেন?
: দেখলাম, খলিফাও তো আমার মতো ভিক্ষুক। তিনিও অন্য আরেকজনের কাছ থেকে চেয়ে আমাদেরকে দান করেন। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কোনো মানুষের কাছে আর হাত পাতবো না। আমি তারই কাছে চাইবো খলিফা যার কাছে খলিফা চান। যিনি সবার রিজিকের মালিক।
সে ফিরে এলো এক আলোকজ্জ্বল পথের দিকে। যে পথ এতোদিন তার অজানা ছিলো। অচেনা ছিলো। অবশেষে সে পরিচয় লাভ করলো এমন এক দাতার, যিনি কারো কাছে চান না, সকলকে দেন। বরং দিতেই ভালোবাসেন। নিজের স্নেহ ও মায়া দিয়ে ঢেকে রখেন প্রতিটি সৃষ্টিকে।



হজরত মোয়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রিয়নবীর প্রিয় সহচর। মনের একান্ত গোপন কথাগুলিও নবিজি তাকে বলতেন। আবার প্রয়োজনে শাসনও করতেন খুব। তিনিই নির্বাচিত হয়েছেন ইয়ামেনের শাসক হিসেবে। এখন তাকে সেখানেই চলে যেতে হবে।
বিদায়ের দিন এলো। আজই তাকে রওনা করতে হবে ইয়ামেনের উদ্দেশে। ঘোড়ায় সাওয়ার তিনি আর নবিজি লাগাম ধরে হাঁটছেন। প্রিয় মানুষটিকে বিদায় দিতে। শেষ বিদায়। হাঁটতে হাঁটতেই একসময় মোয়াজকে বললেন, মোয়াজ, এই বোধ হয়- এটাই তোমার আমার শেষ দেখা। এরপর হয়তো তোমার সাথে আমার আর দেখা হবে না।
বিচ্ছেদের বেদনা মোয়াজ রা. এতোক্ষণ চেপে রেখেছিলেন। কিন্তু আর পারলেন না। অশ্রু আর বাঁধ মানলো না। অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। তপ্তজলে ভিজে গেলো তার গণ্ডদেশ। নবিজির চেখেও পানি এসে গেলো। মুখখানা ফিরিয়ে নিলেন মদিনার দিকে। আর বললেন, মোয়াজ, কাঁদছো কেন? যদিও তুমি আমার থেকে দূরে থাকবে কিন্তু স্মরণ রেখো, মুত্তাকিরাই আমার নিকটতম ব্যক্তি। তারা যে-ই হোক যেখানেই থাকুক।
বিদায়বেলা এই সান্ত্বনাটুকু নিয়েই মোয়াজ রা. চললেন ইয়ামেনের পথে। অশ্রুমাখা নয়নে। ব্যাথাভরা হৃদয়ে।

পকেট
মিতবাক আহমাদ

পাঞ্জাবীর ডান পকেটটা ছিড়ে গেছে।
সেই ছেড়া পকেট থেকে ক্রমাগত পড়ে যাচ্ছে,
স্বপ্ন, প্রেম, নোটবুক আর কলমের মতো
অসম্ভব প্রিয় দরকারি ভালোলাগাগুলো।

আর আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আজও
অক্ষত আছে পাঞ্জাবীর বাঁ পকেট।
সেখানে লোভ হিংসা, কাপুরুষতা
ও দলিত অকেজো কাগজের সাথে
দিনদিন জড়ো হচ্ছে বেঁচে থাকার টেনশন।

সিয়াম
আব্দুল্লাহ আল মাসুম

নীল আকাশে হাওয়ায় ভেসে
রোজার চাঁদটা এসে
জানায় সবকে সালাম।

ফুলে ফলে জোসনামাখা
মিষ্টি মধুর সুবাস রাখা
আসলো খুশির সিয়াম।

ঈদের খুশি
জান্নাতুল মাওয়া জান্নাত

একটি বছর ঘুরে আবার
এলো খুশির ঈদ,
সেই খুশিতে খোকা খুকুর
নেইকো চোখে নিঁদ।

নতুন জুতো জামা পরে
ঈদগাহেতে যাবে,
সবাই মিলে মজা করে
ফিরনি সেমাই খাবে।

ঘুরবে সবাই মজা করে
খেলবে অনেক খেলা,
গরিব দুঃখীর খোঁজ নিয়ে
কাটিয়ে দিবে বেলা।

তোমায় ভেবে
সাবিনা আক্তার

তমাশাচ্ছন্ন নিশির কম্পিত স্বপনে
ভাবোচ্ছাসের পবন বইছে মনে,
তুচ্ছতারে ছিন্ন করে আসো শয়নে
রেখেছি তব তারে চিত্তাঙ্গনে।

অদ্য তোমায় ভেবে নিরলে
আঁখি জল নিষ্ফল টলমলে
তারই ভাবনায় নয়নের রুষানলে।

তোমার তরে করলাম সমর্পণ
মোর এ ভগ্ন হৃদয়াঙ্গন,
উৎফুল্ল আমেজ ভাবনায় ক্ষণ
তোমাতেই ভূলুণ্ঠিত এ জীবন।

আলো আঁধার
আহসান উল্লাহ মুন্না

দিন কেটে যায় আশায় আশায়
তবুও নিরাশ নই,
প্রহর গুনি সারাটি ক্ষণ
যদি সফল হই।

ব্যর্থতা আর হতাশাতে
কাটে সারা বেলা,
জীবনটাকে ফের গোছাতে
করি না কো হেলা।

এইতো আলো এইতো আঁধার
সইতে হবে সবই,
ধৈর্য্য নিয়ে থাকো যদি
উঠবে সুখের রবি।

রিমঝিম আলাপন
মিযানুর রহমান জামীল

রিমঝিম তালে তালে
নৌকার পালে পালে
কী দারুণ বৃষ্টি,

রাত দিন খালে-বিলে
চাঁদ-তারাদের নীলে
ভরে মন দৃষ্টি।

কাঁশবন ফুলে ফলে
মৌমাছি দলে দলে
বৃষ্টিতে ভিজে,

টুপটাপ বনে বনে
বর্ষার আলাপনে
আনন্দ কী যে।

বাঁকা চাঁদের হাসি
আয়েশা সিদ্দিকা আতিকা

বাঁকা চাঁদের মিষ্টি হাসি
আহ! কি অপরূপ
কলরবে মাতি সবাই
দেখে চাঁদের রূপ।

খুশিতে তাই মেতে উঠি
এক সাথেতে সবাই
ভেদাভেদ ভুলে সকলে মিলে
সাম্যর গান গাই।

ঈদের দিনের মতন যদি
হতো প্রতিটা দিন
ধরার বুকের দুঃখ সকল
হয়ে যেত বিলীন।

ঈদের প্রত্যাশা
ফারিহা তাবাসসুম

ঈদের খুশি ছড়িয়ে পড়ুক
সবার প্রাণে প্রাণে,
এই কামনা করছি আমি
ছড়ায় এবং গানে।

কেউ না কাঁদুক এমন দিনে
কেউ না থাকুক পোশাক বিনে,
গরিব-দুখীর মন ভরে দাও
জাকাত-ফিতরা দানে,
ওদের প্রাণ উঠুক ভরে
আনন্দেরই বানে।

ঈদের খুশি দেই ছড়িয়ে
সোহানুর রহমান আশিক

পথের ধারে থাকে ওরা
পায়না জামা ঈদে,
ভাইয়া ভাইয়া ডাক শুনলে
কষ্ট বুকে বিঁধে।

বাড়িয়ে দিই দানের হাত
একটু খোলা দিলে
হাসি মুখে গাইবে গান
ওরা সবে মিলে।

ঈদের খুশি দেই ছড়িয়ে
ওদের সবার মাঝে
দুঃখ ব্যথা ভুলে যেন
সুখের বীণা বাজে।

এলো ঈদ
ফাইজা তাবাসসুম

ঈদ এলো
মুছে ফেলো
কষ্ট ব্যথা সকল,
সবার কাম্য
হবো সাম্য
মুছে ফেলি ধকল।

একসাথে সব
করবো রব
আজকে ঈদের দিনে,
একটু আয়েশ
ফিরনি পায়েশ
খাবো না দুঃখী বিনে।

হীরার চেয়েও দামি
ফুয়াদ আল হাফিজ

মাগো তুমি আমার কাছে
হীরার চেয়েও দামি,
তোমার মতো এ ধরাতে
মিলবে না কেউ জানি।

কতো কষ্টে লালন পালন
করেছো মা তুমি,
বলো না' মা কেমন করে
ভুলবো তোমায় আমি।

বাড়ি ছেড়ে যখন আমি
দূরে কোথাও যাই,
তোমার কথা শুনলে মাগো
মনে শান্তি পাই।

ঈদের খুশি
আবু বকর হারুন

চাঁদ উঠেছে চাঁদ উঠেছে
কাল যে সবার ঈদ,
খোকা-খুকি বেজায় খুশি
গাইছে সুখের গীত।

ধনী-গরিব, আমির-ফকির
কাঁধে রেখে কাঁধ,
এক কাতারে দাঁড়িয়ে সবে,
এইতো ঈদের স্বাদ।

ফিরনি-পায়েস, কোর্মা-পোলাও
সবার ঘরে ঘরে,
ঈদ এসেছে ভালোবাসা
বিলিয়ে দেবার তরে।

ঈদের দিনে খুশির খবর
সবচে বেশি তার,
যারা ছিলেন রোজার দিনে
পাক্কা রোজাদার।

ঈদের খুশি
হাজেরা সুলতানা হাসি

ঈদের দিনে খুশির আমেজ
বইলো খুশির ঢেউ,
এই ঈদেতে খুশি থেকে
বাদ যাবে না কেউ।

হোক না নিঃস্ব হোক না গরিব
হোক না সে টোকাই,
সবাই মিলে চলো আজ
সাম্যের গান গাই।

ধনী গরিব সবাই মিলে
ঘুরতে যাবো আজ,
খুশির আমেজে চারদিকেতে
পড়লো এ কোন সাজ!

গরিবের ঈদ
শরিফ আহমাদ

গরিব মানুষ ঈদের আগে
কিনতে গিয়ে কাপড়,
দাম শুনে প্রাণ কেঁপে ওঠে
ঠিক যেন এক হাপড়।

এদিক ওদিক ঘুরে ফিরেও
হয় না কাপড় কেনা
মাথার উপর ঝুলে আছে
অনেকগুলো দেনা ।

তার উপরে রোগের বোঝা
চেপে আছে ঘাড়ে
পুরান কাপড় দিয়েই তারা
ঈদের নামাজ সারে।



দুই গাভী

এক সাদা গাভী আর লাল গাভী ঝগড়া করছে-
সাদা গাভী : আমি সেরা।
লাল গাভী : না, আমি সেরা।
সাদা গাভী : না না, আমি সেরা।
লাল গাভী : কিভাবে তুমি সেরা?
সাদা গাভী : আমি সাদা গাভী হয়ে সাদা দুধ দেই।
তুমি লাল গাভী হয়ে লাল দুধ দাও দেখি!

কামরুজ্জামান (১৭৩)

লা জওয়াবের গল্প

এক দুষ্টু এক জ্ঞানীলোককে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা বলুন তো আসমানের মোট তারার সংখ্যা কতো?
জ্ঞানীলোক : তোমার উত্তর দেবো তার আগে তুমিই বলো সাগরে মাছের সংখ্যা কতো?
দুষ্টলোক : সাগরের মাছ কি আমি গুনছি? কেমনে বলবো?
জ্ঞানীলোক : আফসোস, জমিনে বসবাস করে জমিনের খবর জানো না। অথচ তুমি আমাকে আসমানের জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো, যা তোমার থেকে লক্ষ কোটি মাইল দূরে!
দুষ্টলোক পুরাই লা জওয়াব!

নাফিসা বিনতে মাওলানা ইউসুফ বিশ্বাস, কুষ্টিয়া

জুমেলের ইন্টারভিউ

প্রশ্নকর্তা : একটা প্লেনে ৫০টা ইট আছে, একটা ইট ফেলে দিলে থাকে ক'টা?
জুমেল : এটা তো একদম সোজা। ৪৯ টা ইট থাকে।
প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা, একটা ফ্রিজে হাতি রাখার তিনটে স্টেপ কী কী?
জুমেল : ফ্রিজটা খুলুন, হাতিটা ঢোকান এবং এরপর ফ্রিজের দরজা বন্ধ করে দিন।
প্রশ্নকর্তা : একটা ফ্রিজে একটা হরিণ রাখার চারটে স্টেপ কী কী?
জুমেল : ফ্রিজটা খুলুন, হাতিটা বের করুন, হরিণটা ঢোকান এবং এরপর ফ্রিজের দরজাটা বন্ধ করে দিন।
প্রশ্নকর্তা : বনে সিংহের আজকে জন্মদিন। সবাই এসেছে শুধু একজন ছাড়া। কে আসেনি এবং কেন আসেনি?
জুমেল : হরিণ আসেনি। কারণ সে এখন ফ্রিজে রয়েছে।
প্রশ্নকর্তা : এক বৃদ্ধা কুমিরভর্তি একটা খাল পার হলো কোনো ক্ষতি ছাড়াই, কীভাবে?
জুমেল : কারণ সব কুমির তখন সিংহের জন্মদিনে গিয়েছিলো।
প্রশ্নকর্তা : শেষ প্রশ্ন, তারপরও বৃদ্ধা মারা গেলেন, কেন?
জুমেল : উমম... আমার মনে হয় তিনি খালের জলে ডুবে গিয়েছিলেন।
প্রশ্নকর্তা : না, প্লেন থেকে যে ইটটা ফেলেছিলো সেটা গিয়ে বুড়ির মাথায় পড়েছিলো। তুমি এখন আসতে পারো।

জান্নাতি বিনতে আব্দুশ শাকুর, কিশোরগঞ্জ

কিশোর কানন সদস্য

৩৪১. আলেমা আতিকা মাহমুদা, শিক্ষিকা, খাতুনে জান্নাত নূরানী হাফেজী বালিকা মাদরাসা, মাহিগঞ্জ, রংপুর
৩৪২. আবিদা সুলতানা আঁখি, হযরত আয়শা সিদ্দীকা মহিলা মাদরাসা, সাভার, ঢাকা

কিশোর কানন সদস্য ফরম

নাম ______________________ পিতা ______________________
জন্ম তারিখ ____________ শ্রেণী ____________ সখ ____________
বিদ্যালয় ____
ঠিকানা ____
মোবাইল নাম্বার ____

সদস্য হতে হলে...
কিশোর কানন বিভাগে লিখতে হলে সদস্য হতে হয়। সদস্যরা লেখার সঙ্গে অবশ্যই সদস্য নং উল্লেখ করবে। 'কিশোর কানন সদস্য ফরম' পূরণ করে, কেটে, খামের ভেতর ৩০ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকিট ভরে পাঠিয়ে দিলে সদস্য করে নেওয়া হয়। ফরমের ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। নামছাপা সংখ্যাটি সৌজন্য পাঠানো হয়।

কৈফিয়তকণ্ঠ

[ছোট্ট করে আপনার লেখার কৈফিয়ত]

বাসার রাতে বিড়াল মারা বলতে কী বোঝায়?
সুমাইয়া বিনতে সাইফুল

কৈফিয়ত : হাস্যরসের দারুণ গল্প। বাসর রাতে বিড়াল মারা সত্যিই অনেক দুরুহ কাজ। আপনার এই গল্প পড়ে অনেকেরই সাধ জাগবে বিড়াল মারার। থাক সে কথা। গল্পটা আরেকটু জম্পেশ করে লিখলে ছাপার আলো দেখতো বৈকি! তাছাড়া এমন কল্পকাহিনির গল্প না লেখাই ভালো। সত্য-মিথ্যার ফারাকটা তো রাখা চাই, নাকি?

কেন কওমী মাদ্‌রাসা সর্বোৎকৃষ্ট
আব্দুল্লাহ আল মামুন (মিশকাত)

কৈফিয়ত : কওমি মাদরাসা উত্তম, সেটা আপনি আমি সবাই জানি। এটা নিয়ে যদি আমরা বারবার শুধু বলতেই থাকি– আমরা উত্তম, আমরা উত্তম; তাহলে লোকে ভাববে– ডাল মে কুছ কালা হ্যায়! তাই শ্লোগান না ধরে আমাদের বরং কওমি মাদরাসার অবদান, কওমি সন্তানদের অবদান, কৃতিত্ব, আত্মত্যাগ মানুষকে জানানো প্রয়োজন। একসময় সবাই বুঝতে পারবে, কওমি মাদরাসা কেন উত্তম। তখন আর আপনার আমার শ্লোগান ধরতে হবে না। লেখার জন্য শোকরিয়া।

শাওয়ালের ৬ রোজা
হাফেজ মাওলানা মিযান বিন আব্দুল মজীদ

কৈফিয়ত : আপনার শাওয়ালের রোজাবিষয়ক লেখাটি যুগোপযোগী। এ বিষয়ক আরেকটি লেখা ছাপা হওয়ায় আপনার লেখাটির স্থান সংকুলান করা গেলো না। ভবিষ্যতে আবারও লেখার আমন্ত্রণ কিন্তু রইলো!

যাকিয়া যায়নাব

কৈফিয়ত : আপনার এত্তোগুলো লেখা পেয়েছি, এই এত্তোগুলো...! সত্যি বলছি, রাগ করিনি। আপনার কাগজে লেখা অক্ষরগুলো ঝরঝরে। পড়তে আরাম বোধ হয়। লেখার শৈলীও আনন্দিত হওয়ার মতো। আপনার জন্য উদার পরামর্শ হচ্ছে, লেখালেখি ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়া।

বয়স হওয়ার পর নানা কারণেই আমাদের দেশের মেয়েদের লেখালেখি ধীরে ধীরে কমে যায়। তাদের প্রতিভার মূল্যায়ন আর সেভাবে কেউ তাকিয়েই দেখে না। ফলাফল– ঝরে যেতে হয় অঙ্কুরেই, কুঁড়িতেই, পুষ্পে...। আপনাকে যেন এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি না হতে হয়, সে আশাবাদ রইলো। বড় লেখক হোন, কামনা করি।

অপ্রত্যাশিত সংবাদ
হাজেরা সুলতানা হাসি

কৈফিয়ত : আপনার গল্প বলার আগ্রহ চমৎকার। তবে গল্প বলার ভাষা এবং গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচনে আরেকটু মুন্সিয়ানা কাম্য। আধুনিক গল্প পড়লে আশা করি বুঝতে পারবেন বিষয়গুলো। তাছাড়া প্রত্যেকটা গল্পে একটা বার্তা রাখতে হয় পাঠকের জন্য। সামনে থেকে বিষয়গুলো নিয়ে বেশ ভাববেন। শুভকামনা রইলো।

আতাউর রহমান খান, জোবাইর আহমাদ, মুহা. মুয্যাম্মিল হক, সুহাইল সাদী

আপনাদের ছড়া-কবিতা মানোত্তীর্ণ। স্থান সংকুলানের অভাবে এ সংখ্যায় প্রকাশ করা গেলো না। আগামী সংখ্যায় প্রকাশ হবে আশা করি।



ঈদের রান্না

নাজিফা জান্নাত

সবজির টিকিয়া

যা লাগবে : সেদ্ধ বুটের ডাল ২০০ গ্রাম, সেদ্ধ পালংশাক এক কাপ, সেদ্ধ গাজর কুচি আধাকাপ, সেদ্ধ ফুলকপি আধা কাপ, সেদ্ধ মটরশুঁটি আধা কাপ, আদা-রসুন বাটা এক টেবিল চামচ, কাবাব মশলা আধা চা চামচ, গরম মশলা এক চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, পেঁয়াজ পাতা কুচি দুই টেবিল চামচ, ধনেপাতা কুচি এক টেবিল চামচ, চিড়া আধা কাপ, তেল ভাজার জন্য, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে করবেন : একটি কড়াইয়ে তেল দিন। তেল গরম হলে পেঁয়াজ, আদা, রসুন, কাঁচামরিচ লাল করে বেরেস্তা করুন। চিড়া বেছে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। বুটের ডাল বাটা সেদ্ধ শাকসবজি চিড়া ও লবণ দিয়ে ভালো করে মেখে ভাজা মশলা, গরম মশলা, কাবাব মশলা, পেঁয়াজ, ধনেপাতা কুচি মিশিয়ে নিন। এবার গোল গোল বলের মতো পানিতে হাত দিয়ে চেপে চ্যাপ্টা করে গরম ডুবো তেলে হাল্কা মৃদু আঁচে লাল বাদামি করে ভেজে তেল ঝরিয়ে সস বা চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ভেজিটেবল মুঠো কাবাব

যা লাগবে : ফুলকপি-পাতাকপি কুচি ২০০ গ্রাম, গাজর-ক্যাপসিকাম কুচি ১০০ গ্রাম, শালগম বিট কুচি ১০০ গ্রাম, মাংসের কিমা ১০০ গ্রাম, ডিম, একটা, পাউরুটি স্লাইস তিনটা, আদা-রসুন বাটা দুই চা চামচ, কাবাব মসলা আধা চা চামচ, গোল মরিচ গুঁড়া এক চা চামচ, কাঁচামরিচ কুচি এক চা চামচ, ধনেপাতা-পুদিনা পাতা কুচি দুই টেইবল চামচ, পেঁয়াজ কুচি দুই টেবিল চামচ, পনির কুচি দুই টেবিল চামচ, তেল ভাজার জন্য, লবণ পরিমাণ মতো।

যেভাবে করবেন : প্রথমে সবজি কেটে ভালো করে ধুয়ে নিন। পাউরুটি মিহি কুচি করে রাখুন। এবার মাংস কিমার সঙ্গে সব উপকরণ ভালো করে মেখে মুঠো করে ডিমে চুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ায় গড়িয়ে গরম ডুবো তেলে বাদামি করে ভেজে তেল ঝরিয়ে ট্রেতে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

শাহি হালিম

ক) যা লাগবে : মাংস ১ কেজি, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, ধনেপাতা গুঁড়া আধা চা চামচ, জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ, গরম মশলার গুঁড়া ১ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, পেঁয়াজ বাটা ৪ টেবিল চামচ, লবণ পরিমাণমতো, সরিষার তেল ১ কাপ, আস্ত গরম মশলা পরিমাণমতো, টক দই আধা কাপ, চিনি সিকি চা চামচ।

যেভাবে করবেন : মাংস টুকরা করে ধুয়ে উপরের সব উপকরণ দিয়ে মাংস রান্না করে নিন।

খ) যা লাগবে : পাঁচমিশালি ডাল ২ কাপ, গম সিকি কাপ, পোলাওর চাল আধা ভাঙা সিকি কাপ, লবণ পরিমাণমতো, হলুদ ও মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ করে, বেরেস্তা সিকি কাপ, কাঁচামরিচ কুচি ৩/৪টা, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, চিলি ওয়েল ২ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, শুকনা মরিচ আস্ত ২টা, লেবু স্লাইস ১টা, লেবুর রস পরিমাণমতো, বিট লবণ পরিমাণমতো, তেজপাতা ২/৩টা, ভাজা মশলার গুঁড়া বা হালিমের মশলা ১ টেবিল চামচ, তেল ৪ টেবিল চামচ।

যেভাবে করবেন : গম ভেজে গুঁড়া করে পানি দিয়ে আধা ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। ডাল ৩/৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। এবার পরিমাণমতো পানি, লবণ, হলুদ, মরিচ গুঁড়া, চাল একসঙ্গে সেদ্ধ বসিয়ে দিন। কিছুক্ষণ পর গম দিন। ডাল সেদ্ধ হয়ে এলে রান্না করা মাংস ঢেলে দিন। আস্ত কাঁচামরিচ দিন ৩/৪টা। অন্য পাত্রে এবার ৪ টেবিল চামচ তেল দিয়ে পেঁয়াজ কুচি দিন, তেজপাতা ও শুকনা মরিচের ফোড়ন দিন। এ ফোড়ন হালিমে ঢেলে দিন। এবার হালিমের মশলা বা ভাজা মশলার গুঁড়া দিন। কিছুক্ষণ রেখে চুলা বন্ধ করে দিন বেরেস্তা দিয়ে। এবার পরিবেশন ডিসে ঢেলে আদা কুচি, ধনেপাতা কুচি, লেবুর রস, চিলি অয়েল ও বেরেস্তা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।